বিচিত্রা

যতীন্দ্রমোহন রায়চৌধুরী

ইণ্ডিয়ান বুক কনসার্ন
৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

সূচীপত্র

যুগাবতার পরমহংস

পৃথিবীতে যখন ধর্মের নামে অধর্মের ধ্বজা সমস্ত মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তখনই অবতীর্ণ হন যুগে যুগে যুগাবতার। তেমনি এক যুগ সন্ধিক্ষণে হুগলী জেলার কামারপুকুর নামক এক অখ্যাত গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন পরমপুরুষ যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

কামারপুকুর গ্রামের পশ্চিমদিকে একটা খালের ধারে একটা আম-বাগান। ছেলেরা সেদিন সেখানে খেলা করিতেছিল।

সেই গ্রামে লাহাদের বাড়ীতে পূজা-পার্বণ উপলক্ষে প্রায়ই যাত্রা-কথকতা হইত। বালকেরা যাত্রা শুনিয়া আমবাগানে সেদিন তাহার অভিনয়ের অনুকরণ করিয়া খেলা করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে একটি বালকের ছিল অসাধারণ স্মৃতিশক্তি। তাঁহার নাম গদাধর চট্টোপাধ্যায়। বালক গদাধর যাত্রার যে পালাটির অভিনয় দেখিতেন, হুবহু তাহারই নকল করিয়া দেখাইতে পারিতেন, অঙ্গভঙ্গী পর্যন্ত অবিকল তেমন করিতে পারিতেন।

সেদিন তাঁহারা 'শ্রীকৃষ্ণযাত্রা' খেলিতেছিলেন। বালক গদাধর নিজেই

কৃষ্ণ, নিজেই রাধা সাজিয়া অভিনয় করিতেছিলেন। হঠাৎ সেই সময় বালক গদাধর সংজ্ঞাহীন হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন।

বালকেরা ভয়ে সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল, কেহ বা কাপড়ের আঁচল ভিজাইয়া খাল হইতে জল আনিয়া মাথায় দিতে লাগিল, কেহ বা আমের ডাল ভাঙ্গিয়া বাতাস করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে গদাধরের জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। সঙ্গীরা কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাঁহার কি হইয়াছিল। বালক কিছুই বলিল না, শুধু দূর আকাশের পানে চাহিয়া রহিল।

গামের বৃদ্ধরাও মাঝে মাঝে গদাধরকে ডাকিয়া তাঁহার কণ্ঠে যাত্রাগান অথবা কথকতা শুনিতে চাহিতেন। বালক তাহা সানন্দে শুনাইতেন। গ্রাম্যবৃদ্ধরা দেখিতেন, গদাধর অনেক সময় গান গাহিতে গাহিতে কখনও আপনার মনে হাসিতেছেন, কখনও আপনার মনে কাঁদিতেছেন। তাঁহার সামনের শ্রোতাদের কথা তিনি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন।

বালকের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় অতি সাধারণ গৃহস্থ ছিলেন। দরিদ্রভাবেই তাঁহার দিন চলিত। তাহার উপর তিনি এবং তাঁহার স্ত্রী চন্দ্রমণি দেবী একান্ত ধর্মভীরু ছিলেন। অধিকাংশ দিন চন্দ্রমণি দেবী নিজের সমস্ত খাদ্য অতিথিকে দিয়া নিজে উপবাসী থাকিয়া যাইতেন।

বাড়ীতে ছিল প্রভু রঘুবীর, গৃহদেবতা। স্বামী-স্ত্রীতে সেই ঠাকুরের সেবাতেই সংসারের সুখসাধ সমস্ত ভুলিয়াছিলেন।

দুই ভাই এবং এক বোনের পর গদাধর সংসারে আসিয়াছিলেন। লাহাদের বাড়ীতে গ্রামের পাঠশালাতেই তাঁহাকে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু তাঁহার মন 'পাঠশালা পালাইয়া' সেই গ্রামের আমবাগানে ঘুরিয়া বেড়াইত।

গদাধর যখন নিজের খেয়ালে এইভাবে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন হঠাৎ একদিন তাঁহার পিতা পরলোকগমন করিলেন। তখন গদাধরের বয়স মাত্র সাত বৎসর।

গদাধরের দুই দাদা, রামকুমার ও রামেশ্বরের উপর সংসার চালাইবার ভার পড়িল। দরিদ্রের সংসার তাহার উপর পিতার মৃত্যু আসিয়া সংসারকে দরিদ্রতর করিয়া দিল। বালক গদাধরের আর লেখাপড়া হইল না। তিনি আপনার মনে খেলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। হঠাৎ বালক গদাধর একদিন শুনিলেন তাঁহাকে সেই গ্রাম ছাড়িয়া, সেই ভূতির খাল ছাড়িয়া, সেই আমবাগান ছাড়িয়া রামকুমারের সঙ্গে কোথায় কোন্ শহরে যাইতে হইবে।

আত্মীয়-স্বজনদের পরামর্শে অর্থ-উপার্জনের চেষ্টায় রামকুমার কলিকাতায় আসিলেন এবং ঝামাপুকুর-অঞ্চলে একটি টোল খুলিলেন। দেশে গদাধরের কোন কিছু হইতেছে না দেখিয়া গদাধরকে তিনি তাঁহার কাছে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন। ইচ্ছা, গদাধর টোলের ছাত্রদের খাওয়া-দাওয়া, রান্নাবান্নার ভার লইবেন এবং পড়াশুনা করিবেন। কিন্তু পড়াশুনা বিশেষ কিছুই হইল না। তবে টোলের সাংসারিক কাজকর্মে গদাধর দাদাকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাতেও দারিদ্র্য ঘুচিল না।

ঝামাপুকুরের সেই সামান্য টোলে গদাধর যখন দাদার ছাত্রদের খাওয়া-দাওয়ার আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময় কলিকাতা শহরে এক বিরাট রাজপ্রাসাদে একটি বিধবা রমণীর চোখে ঘুম ছিল না। সেই রমণীর নাম রাণী রাসমণি। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি বিরাট সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়া বাংলাদেশে দান-ধ্যানে ও নানা সদনুষ্ঠানে প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু এত ঐশ্বর্যের মধ্যেও তাঁহার মনে শান্তি ছিল না।

কলিকাতা হইতে কিছুদূরে দক্ষিণেশ্বর নামক গ্রামে গঙ্গার তীরে তিনি এক বিরাট ঠাকুরবাড়ী নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ঐকান্তিক বাসনা ছিল যে, সেইখানে তিনি জগন্মাতার বিগ্রহ স্থাপন করিবেন, এবং দেবীর প্রসাদে নিত্য দীন-দরিদ্র-আতুরের সেবা হইবে। কিন্তু রাণী জাতিতে ছিলেন মাহিষ্য; তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরকে কোনও সদ্-ব্রাহ্মণ পূজা করিতে রাজী হইল না।

এই ঘটনার কথা ঝামাপুকুরের সেই টোলে গিয়া যখন পৌঁছিল,

তখন সরলপ্রাণ রামকুমার গোঁড়া ব্রাহ্মণদের আচরণের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। রামকুমার ব্যবস্থা দিলেন যে, রাণী যদি তাঁহার গুরুর নামে ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহা হইলে কোন ব্যাঘাতই ঘটিতে পারে না। সেই ব্যবস্থায় রাণীর মন আনন্দে বিভোর হইল এবং রামকুমারের উপর তিনি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ভার দিলেন।

গদাধর সেদিনও নিঃস্পৃহ। তাই রামকুমারের সঙ্গে সেদিন তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন বটে, কিন্তু সেখানে অন্নগ্রহণ করিলেন না, বাজার হইতে মুড়ি-মুড়কি কিনিয়া খাইলেন।

রামকুমার ঐ মন্দিরের পূজারী হইলেন। গদাধর আসেন-যান, কিন্তু পূজার কোন কাজে তিনি হাত দেন না। শেষকালে সকলের অনুরোধে তিনি ঠাকুরকে সাজান গোছানোর কাজ লইলেন। প্রতিদিন আত্মভোলা সেই গ্রাম্য যুবকটি নিজের মত করিয়া ঠাকুরকে সাজাইতে লাগিলেন। ঠাকুরের নাম রাখা হইল ভবতারিণী। পূজারী পূজা করিয়া যান, ক্ষুধার্তেরা দলে দলে আসিয়া নিত্য প্রসাদ পায়, রাণীর জয়গানে গঙ্গাতীর নিত্য-মুখরিত হয়। তাহারই আড়ালে, সকলের দৃষ্টির অগোচরে, কেহ জানে না, সেই শিক্ষা-দীক্ষাহীন গ্রাম্য যুবকটির মনে কি মহা-আলোড়ন চলিতেছে। ভাবে বিভোর হইয়া গদাধর পূজা ভুলিয়া যাইতেন। পূজার নৈবেদ্য নিজেই খাইয়া ফেলিতেন।

ঠাকুর-বাড়ীতে হৈ হৈ পড়িয়া গেল। সকলে বলিল, গদাধর পাগল হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে আর ঠাকুরবাড়ীতে ঢুকিতে দেওয়া উচিত নয়। কথাটা রাণীর কানে গেল। নীরবে তিনি সব শুনিলেন। স্থির করিলেন নিজের চোখে দেখিবেন, ব্যাপারটি কি! ঠাকুর-বাড়ীর লোকেরা গদাধরকে শাসাইল,—"ঠাকুর, সাবধান হও, রাণী-মা নিজে আসছেন।"

রাণী-মা আসিলেন, কিন্তু গদাধরকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। শেষকালে রাণী খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিতে পাইলেন ভবতারিণীর পাষাণ-প্রতিমার আড়ালে গদাধর ছোট ছেলের মত লুকাইয়া আছে। তাই দেখিয়া রাণীর দুই চোখ দিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল। যে

মহাপুরুষকে আজ ভক্তিভরে বিশ্বজগৎ নবপ্রবর্তক বলিয়া স্বীকার করিতেছে, সেদিন বাংলাদেশের একজন অশিক্ষিতা নারী প্রথম তাঁহাকে চিনিয়াছিলেন।

মন্দিরের কাজের ভার রাণী গদাধরের হাত হইতে তুলিয়া লইলেন। ইহাতে গদাধরের ভিতর-বাহির এক হইয়া গেল। মাতৃহারা শিশু যেমন হঠাৎ নিশীথ-রাত্রিতে ঘুম হইতে উঠিয়া মাতৃবিরহে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে এবং যতক্ষণ না মায়ের স্পর্শ পায়, ততক্ষণ কাঁদিয়া আকুল হয়, গদাধর তেমনি অস্থির হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুরিতে লাগিলেন। গঙ্গার তীরে সংজ্ঞা হারাইয়া কখনও তিনি লুটাইয়া পড়েন, কখনও পাগলের মত বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া ধূলায় গড়াগড়ি দেন। সেই তীব্র আবেগের যন্ত্রণা কতকটা উপশমিত হইলে তিনি অন্তরের উপলব্ধিতে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য বাহির হইলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের অনুশাসন অনুযায়ী সাধনা করিলেন। এবং তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে এই মহাসত্যে উপনীত হইলেন যে, জগতের ধর্মাচরণের পথে কোথাও কোন ভেদ নাই, সব পথ একই লক্ষ্যে গিয়া শেষ হইয়াছে।

আমি বড়, তুমি ছোট, এই ধরনের ভেদজ্ঞান হইতে সংসারে অশান্তি আসে। নিজের মন হইতে এই ভেদজ্ঞান কার্যতঃ ঘুচাইবার জন্য তিনি স্বচ্ছন্দে কাঙালীদের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিতেন। যে সমস্ত কাজকে আমরা নীচজাতির কাজ বলিয়া আলাদা করিয়া রাখিয়াছি, একে একে সেই সব কাজ নিজের হাতে করিয়া নিজেকে সঠিকভাবে সকল রকম ভেদবুদ্ধি হইতে মুক্ত করিলেন। নিজের মন হইতে লোভকে এমনভাবেই তাড়াইয়াছিলেন যে, টাকার স্পর্শ পর্যন্ত তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। তৎকালীন ধর্মবিমুখ উনবিংশ শতাব্দীতে ভগবদ্‌ভক্তির এমন কঠোর একনিষ্ঠ সাধনা আর কাহারও জীবনে দেখা যায় নাই। এইভাবে যখন নিজের মনকে সব ভেদ, সব ক্লেদ হইতে মুক্ত করিতে পারিলেন, তখন আমরা দেখিলাম, সব বিদ্যা সব জ্ঞানের সারকথা তাঁহার চিত্তে শতদলের মত আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সর্ব ধর্মমতে তাঁহার সমান বিশ্বাস ছিল এবং সমান নিষ্ঠার সহিত তিনি সব ধর্মের পথে সাধনা করিতেন এবং তাহার ফলে তিনি জগৎকে জানাইয়া গিয়াছেন যে, "যত মত তত পথ" এবং সব পথের শেষে আছে সেই একই লক্ষ্য। তিনি খ্রীস্টান হইয়া খ্রীস্টান ধর্মের সাধনা করেন, মুসলমান হইয়া ইসলাম ধর্মের সাধনা করেন, তান্ত্রিক হইয়া তন্ত্রমতের সাধনা করেন, শাক্ত হইয়া শক্তিসাধনা করেন, বৈষ্ণব হইয়া বৈষ্ণব-ভক্তিমার্গের সাধনা করেন। মাত্র দ্বাদশ বৎসরে তিনি ভারতবর্ষে প্রচলিত সর্বপ্রকার ধর্মমতের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন।

যখন যে-ভাবে তাঁহার সাধনা করিতে ইচ্ছা হইত, ভগবানের কৃপায় তাঁহার অনুকূল ক্ষেত্র আপনা হইতেই প্রস্তুত হইত। এক একটি মতে সিদ্ধি লাভ করিয়া তিনি কিছুদিন ঐভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন। ঐ সময় তাঁহার আহারাদির কোন নিয়ম থাকিত না, কোথা দিয়া দিনরাত্রি চলিয়া যাইত, অনেক সময়ে সে বিষয়ে জ্ঞান থাকিত না। পঞ্চবটীর তলায় ধ্যানস্থ রামকৃষ্ণকে জড়বস্তু মনে করিয়া পক্ষিগণ তাঁহার মাথায় বসিয়া খেলা করিত।

এই সকল কঠোর সাধনায় তাঁহার দেহ ও মনের এক আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। শরীরটি শিশুর মত কোমল হইয়া গিয়াছিল। আমরা যেমন শৈত্য ও উষ্ণতা অনুভব করিয়া থাকি, অন্য কেহ নিকটে আসিবামাত্র তিনি তেমনি সে ব্যক্তি শুচি কি অশুচি, তাহা অনুভব করিতে পারিতেন। নিদ্রিত অবস্থাতেও তাঁহার হস্তে টাকা ছোঁয়াইলে শিঙ্গিমাছের কাঁটার আঘাতের ন্যায় কষ্ট পাইতেন।

তোতাপুরী স্বামীর নিকট সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করিবার পর হইতে তিনি 'রামকৃষ্ণ' নামে পরিচিত, এবং সেই নামেই আজ তিনি জগতে পূজিত। যিনি সকল তত্ত্বের মধ্যে সার এবং সত্যকে সর্বদা উপলব্ধি করেন, জীবনে বরণ করেন, ঈশ্বর-সাধনায় সিদ্ধ সেই মহাপুরুষকে পরমহংস বলে। সেই জন্যই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশকে আধ্যাত্মিক অধঃপতন হইতে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, এবং যত দিন যাইবে, ততই জগতের অন্যান্য দেশও এই

দ্বন্দ্বাতীত সর্ব-মালিন্য-মুক্ত মহাপুরুষের জীবনের মধ্যেই এই ধর্মবিমুখ যুগের বহু সমস্যার নিঃসংশয় সমাধান খুঁজিয়া পাইয়া ধন্য হইবে।

মহাপুরুষ কবীর

পাঠান সুলতানগণ যখন ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতেন, তখন উত্তর ভারতে কয়েকজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। এই মহাপুরুষগণ হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মধ্যে মিলন ঘটাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সকল মহাপুরুষদের মধ্যে কবীর অন্যতম। নূর সেখ নামক একজন জোলা স্ত্রীর সহিত পথে যাইতে যাইতে পরিত্যক্ত একটি শিশু কুড়াইয়া পায়—একজন মৌলবী সেই শিশুর নাম দেন কবীর। কিন্তু ইহা জন-প্রবাদ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে "১৩৯৮ খ্রীস্টাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমাতিথিতে কবীর কাশীর লহরতলা নামক স্থানে জোলা রমণী নীমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল নূর। অল্পবয়সেই কবীরের ধর্মে গভীর অনুরাগ জন্মে। কথিত আছে, কবীর সাধু রামানন্দের সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন। তবে রামানন্দ স্বামীর কাছে কবীর দীক্ষাও পান নাই, শিক্ষাও পান নাই, তবু তাঁহাকে যে রামানন্দ স্বামীর শিষ্য বলা হয়—তাহার কারণ আছে।

কবীর যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সংসারী হইয়াছিলেন—রামানন্দ স্বামী তখন তাঁহার ধর্মমত কাশীধামে প্রচার করিতেছিলেন। রামানন্দ স্বামী জাতিভেদ মানিতেন না, তাঁহার কাছে স্পৃশ্যাস্পৃশ্য-ভেদও ছিল

না। কবীর তাঁহারই প্রচারিত উপদেশ অনুসরণে নিজের ধর্মজীবন গঠন করিতেছিলেন। কবীরের বড় সাধ ছিল তিনি রামানন্দ স্বামীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিবেন।

কিন্তু তিনি অস্পৃশ্য জোলা, সাহস করিয়া তাই স্বামীজীর কাছে সে প্রস্তাব করিতে পারেন নাই। তাহা ছাড়া স্বামীজীর অন্যান্য শিষ্যদের ইহাতে আপত্তি হইবে, তাহারাই বাধা দিবে। কবীর তাই এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। স্বামীজী যে ঘাটে প্রত্যহ শেষরাত্রে প্রাতঃস্নান করিতেন, সেই ঘাটের পৈঠায় মড়ার মত পড়িয়া থাকিলেন। স্বামীজী যেমন স্নান করিয়া ঘাটে উঠিয়াছেন, অমনি তাঁহার পায়ে সহসা মানুষের দেহ ঠেকিতেই তিনি আপনা হইতেই বলিয়া উঠিলেন, "আরে রাম কহ, রাম রাম কহ।"

তাঁহার মুখ হইতে যেমন 'রাম' নাম উচ্চারিত হইয়াছে, অমনিই কবীর উঠিয়া বসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—"প্রভু আমি জোলার ছেলে কবীর, আপনার পাদস্পর্শের সঙ্গে আপনার মুখের 'রাম' নাম শুনে আমার দীক্ষা হয়ে গেল।"

স্বামীজী বলিলেন—"বাবা, তুমি পরম ভক্ত, তোমার দেহ অতি পবিত্র, তোমার মুখে আমি দিব্যজ্যোতিঃ দেখতে পাচ্ছি। আজ থেকে তুমি আমার শিষ্য হলে। তুমি সাধনা কর, কালে সিদ্ধিলাভ করবে।"

কবীর বলিলেন—"প্রভু আমি অস্পৃশ্য জোলা, মূর্খ, অধম। তার উপর গৃহস্থ সংসারী। আমার দ্বারা কি সাধনা হবে বলুন?"

স্বামীজী কহিলেন—"বৎস, অস্পৃশ্য জোলা হলেও যে চরম জ্ঞান লাভ করা যায়, ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের জ্ঞানগুরু হওয়া যায় এবং গৃহস্থ সংসারী হয়েও যে ধর্মসাধনায় চরম সিদ্ধিলাভ করা যায়, আর নিরক্ষর মূর্খ হয়েও যে অসামান্য কবিত্বশক্তি লাভ করা যায়, এই দুনিয়ায় তা তুমিই প্রমাণ করবে।"

কবীর যাঁহারই শিষ্য হন, তিনি প্রচার করিতে লাগিলেন যে, ধর্মে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালের সমান অধিকার আছে। হিন্দু-মুসলমান সব জাতির লোকই সাধক হইয়াছেন। সাধনার মধ্যে কোন বাদ-বিচার নাই।

তিনি বলিতেন—"ভগবান এক বই দুই নয়। একমাত্র তিনিই সকল জাতির সকল যুগের সকল দেশের মানুষের উপাস্য। এই সত্য না বুঝে মানুষ মিছামিছি বিবাদ করে মরে।"

কবীর বলিতেন—"তোমরা ধর্মের নামে বিবাদ করো না, হিন্দু-মুসলমান সবাই একযোগে আমার বাক্য শোন।"

এ সকল কথা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের লোকেরই ভাল লাগিল না। তাঁহার উপর চারিদিক হইতে অত্যাচারও হইতে লাগিল। কিন্তু কবীর তাহাতে দমিলেন না। কবীর সারাদিন ভগবানের নাম লইয়াই থাকিতেন।

তাঁহার জীবিকার উপায় ছিল তাঁত বোনা। তিনি প্রত্যহ একখানি মাত্র বস্ত্র বয়ন করিতেন এবং সেই বস্ত্র বিক্রয় করিয়া যাহা পাইতেন, তাহা হইতে নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের মত অর্থ রাখিয়া বাকি অর্থ দরিদ্র সেবায় দান করিতেন। একদিন কবীর তাঁহার বোনা কাপড় হাতে লইয়া বিক্রয়ের জন্য বাজারে দাঁড়াইয়া আছেন. এমন সময়ে এক দরিদ্র আসিয়া সেই বস্ত্রখানি ভিক্ষা চাহিল। কবীর উহা দান করিয়া খালি হাতে ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। এ কাজে তাঁহার অবহেলা দেখিয়া একদিন জননী বলিলেন—"বাবা, তুমি সর্বদা ভগবানের নাম নিয়ে মেতে থাক, এদিকে সংসার যে আর চলে না।"

কবীর জবাব দিলেন, "মা যিনি চিরকাল লক্ষ লক্ষ জীবের আহার যুগিয়ে আসছেন—তিনিই ব্যবস্থা করবেন, তুমি ভেব না।"

কথিত আছে যে, তাঁহার দানে তুষ্ট হইয়া ভগবান কবীরবেশে কবীরের গৃহে আবির্ভূত হইয়া বহু খাদ্যদ্রব্য তাঁহার মাতার নিকট দিয়া গিয়াছিলেন। কবীর গৃহে আসিয়া সেই বিপুল খাদ্যসম্ভার দেখিয়া বিস্মিত হইয়া যান। তারপর সমুদয় খাদ্যসামগ্রী তিনি দীন-দুঃখী সাধুদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন। প্রকৃতপক্ষে কবীরের মাতার ভাবিবার প্রয়োজনই থাকিল না। কবীরের বহু ভক্ত জুটিয়াছিল—তাহারাই অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করিতেন। কবীরকে লজ্জা দিবার জন্য একবার কাশীর ব্রাহ্মণগণ তাঁহার কাছে ভিক্ষা চাহিল। কবীরের দৈন্যই গর্বের বস্তু, তিনি লজ্জা পাইবেন কেন? তাঁর ধনী ভক্তগণ ব্রাহ্মণদের প্রার্থনা পূরণ করিল। ব্রাহ্মণগণ

প্রচুর ধন পাইল দেখিয়া বহু লোক আসিয়া কবীরের কুটিরে ভিড় করিল, মহাপুরুষ বলিয়াও দেশে দেশে কবীরের খ্যাতি রটিয়া গেল—সেজন্যও বহু লোক কবীরের কাছে সর্বদা যাতায়াত করিতে লাগিল।

করীর দেখিলেন লোকের ভীড় তাঁহার সাধনায় বাধা জন্মাইতেছে। তখন তিনি ইচ্ছা করিয়া এমন একটা অসঙ্গত কাজ করিয়া ফেলিলেন যে, লোকে ছি ছি করিয়া তাঁহার কাছ হইতে পলাইল। কবীর তখন পরমানন্দে ভগবানের নাম করিতে লাগিলেন।

কবীর লেখাপড়া জানিতেন না। কঠোর সাধনার দ্বারা তিনি জ্ঞানী হইয়াছিলেন। মূর্খ জোলার মুখে পরম জ্ঞানের কথা শুনিয়া লোকে বুঝিয়াছিল যে, কবীর ঈশ্বরের কৃপালাভ করিয়াছেন।

কবীর ভারতবর্ষের একজন ধর্মগুরু। কিন্তু অন্যান্য ধর্মগুরুর মতো তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন না। গৃহী হইয়াও তিনি ধর্মপ্রচার করিয়া ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম লোঈ। তাঁহার একটি পুত্র ও একটি কন্যা ছিল। পুত্রের নাম কমাল ও কন্যার নাম কমালী। কবীর কাশীধামেই সমস্ত জীবন যাপন করেন এবং সেখানেই তিনি ধর্মপ্রচার করেন।

কাশীর বড় বড় হিন্দু পণ্ডিতরা তাঁহার ধর্মমতকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার উপর বহু প্রকার অত্যাচার করিয়াছিলেন, চক্রান্ত করিয়া তাঁহাকে বারংবার বিপন্ন করিতেও ছাড়েন নাই। কবীরের এমনই শক্তি যে, শেষপর্যন্ত তাঁহার ধর্মমতের জয় হইয়াছিল। বহু হিন্দু-মুসলমান তাঁহার শিষ্য ও ভক্ত হইয়াছিলেন। কবীরের দোঁহাগুলি পড়িলে তাঁহার ধর্মমত জানা যায়।

কবীর ১২০ বৎসর জীবিত ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি কাশী ত্যাগ করিয়া গঙ্গার পরপারে মগহরে গিয়া বাস করেন। একজন শিষ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"কাশীতে দেহত্যাগ করিলে মুক্তি হয়, আপনি চিরজীবন কাশীতে কাটিয়ে যেখানে মরলে গাধা হয়, সেখানে দেহত্যাগ করতে এলেন কেন?"

কবীর জবাব দিয়াছিলেন—"ভগবানে প্রেম না থাকলে কাশীর শিব-

মন্দিরে মরলেও মুক্তি হবে না। প্রেম থাকলে মগহরই স্বর্গ হয়ে উঠে। লোকের ভ্রান্ত ধারণা দূর করবার জন্যই আমি মগহরে মরতে এসেছি।”

১৪৪৮ খ্রীষ্টাব্দে গোরখপুর জেলার মগহর নামক স্থানে একটি জীর্ণ-কুটীরে ভক্ত কবীরের তিরোভাব ঘটে। শোনা যায়, কবীরের মৃতদেহ লইয়া হিন্দু ও মুসলমান শিষ্যদের মধ্যে তুমুল বিবাদ বাধিয়াছিল। হিন্দুরা চাহিয়াছিল তাঁহার দেহ হিন্দুমতে সৎকার করা হউক এবং মুসলমানরা বলিয়াছিল তাহাদের প্রথা অনুযায়ী কবর দেওয়া হউক। তখন দুই দলের মধ্যে হাতাহাতি হওয়ার উপক্রম। শেষে কুটীরের দরজা খুলিয়া দেখা গেল যে, সেখানে তাঁহার মৃতদেহ নাই। পড়িয়া আছে একরাশ শ্বেতপদ্ম। তখন হিন্দু শিষ্যরা একভাগ কাশীতে লইয়া গিয়া সৎকার করিলেন, আর মুসলমান ভক্তরা আর একভাগ কবর দিলেন।

গৌতম বুদ্ধ

নেপালের কাছাকাছি হিমালয়ের পাদদেশে অতীতকালে কপিলাবস্তু নামক একটি ছোট রাজ্য ছিল। এই রাজ্যটি ছিল শাক্য নামক ক্ষত্রিয়দের। শাক্যদের মধ্যে যিনি প্রধান বা কুলপতি ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল শুদ্ধোধন। বুদ্ধদেব এই শুদ্ধোধনের একমাত্র পুত্র। বুদ্ধদেবের বাল্যকালের নাম ছিল গৌতম ও সিদ্ধার্থ।

গৌতমের জননী তাঁহার জন্মের পর সাতদিনের মধ্যেই মারা যান। গৌতমের বিমাতা কিসাগৌতমী তাঁহাকে লালনপালন করেন। ষোল বৎসর বয়স হইলে গৌতম যুদ্ধবিদ্যায় বীরপুরুষ হইয়া উঠিলেন। শুদ্ধোধন ভাবিলেন যে, গৌতম তাঁহার উপযুক্ত বংশধরই হইয়াছেন; গৌতমের দ্বারা শাক্যকুলের বীরত্বগৌরব নিশ্চিত বাড়িবে। কিছুদিন পরে গৌতমের হাতে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া তিনিও বিশ্রাম গ্রহণ করিতে পারিবেন।

গৌতম নির্ভীক যোদ্ধা হইলে কি হইবে? তাঁহার অন্তর ছিল কুসুমের মত কোমল। তিনি কাহারও দুঃখকষ্ট দেখিতে পারিতেন না, কাহারও কোন কষ্ট দেখিলে কাঁদিয়া আকুল হইতেন। জীবজন্তুর বেদনাও তিনি সহ্য করিতেন না। তাঁর বাল্যজীবনের একটি আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে—

একদিন গৌতম উদ্যানে বসিয়া আছেন এমন সময়ে আকাশ হইতে

একটি উড়ন্ত হংস পাখা ঝট্‌পট্‌ করিতে করিতে তাঁহার পায়ের কাছে আসিয়া পড়িল। তিনি হংসটিকে তুলিয়া দেখিলেন যে, তাহার বুকে একটি বাণ বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এবং ক্ষতমুখ হইতে রক্ত পড়িতেছে। দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল। তিনি হংসটির বক্ষ হইতে সন্তর্পণে বাণটি খসাইয়া লইলেন। তারপর জলাশয় হইতে জল আনিয়া ক্ষতস্থান ধুইয়া দিলেন এবং তাহাতে ঔষধ লাগাইয়া দিলেন।

এমন সময়ে সিদ্ধার্থের মাতুলপুত্র দেবদত্ত হংসটিকে খুঁজিতে খুঁজিতে সেখানে উপস্থিত হইল। সে সিদ্ধার্থের কাছে আসিয়া বলিল—"সিদ্ধার্থ, আমার হাঁসটি আমাকে ফেরত দাও। আমি উড়ন্ত হাঁসটিকে বাণ মেরেছিলাম, আমার বাণেই হাঁসটি আহত হয়েছে। দেখ দেখি, আমি কেমন লক্ষ্যভেদ করতে শিখেছি, উড়ন্ত হাঁসকে পর্যন্ত আমি তীর দিয়ে মারতে পারি।"

সিদ্ধার্থ বলিলেন—"ভাই, তুমি এমন নিষ্ঠুর খেলা ছেড়ে দাও। অবলা পক্ষীকে দুঃখ দিয়ে তুমি আনন্দ পাও? ছিঃ, এমন কাজ আর কোরো না!"

দেবদত্ত বলিল,—"তোমার উপদেশ পরে শুনব। এখন হাঁসটি আমাকে ফিরিয়ে দাও, দেখি। ক্ষত্রিয়ের ছেলের অত মায়ামমতা থাকলে চলে না।"

সিদ্ধার্থ বলিলেন,—"ক্ষত্রিয়ের ঘরে জন্মালেই নিষ্ঠুর হতে হবে, এ কেমন কথা ভাই? এ হাঁস আমি দেবনা। যদি কোন ব্যক্তি কোন প্রাণীকে হত্যা ক'রে সেই প্রাণীর অধিকারী হয়, তবে যে ব্যক্তি কোন প্রাণীকে জীবন দেয়, সে কেন সেই প্রাণীর অধিকারী হবে না?"

"একে আমি বাঁচিয়ে তুলেছি। মরে গেলে তুমি এর মালিক হতে। এ পাখীটিকে আমি প্রাণ দিয়েছি, আমি এখন এর অধিকারী, এ হাঁস তোমাকে দেব না।"

দেবদত্ত বলিল,—"এ হাঁস আমার। আমাকে ওটা দাও। তোমার হৃদয় দেখছি বালিকার মত। এইরূপ হৃদয় নিয়ে তুমি রাজ্য রক্ষা করবে কি করে?"

সিদ্ধার্থ বলিলেন,—"তুমি শাক্যরাজ্য নিতে পার, আমি ছেড়ে দিতে রাজী আছি ; কিন্তু হাঁসটিকে ছাড়ব না।"

দেবদত্ত অবাক্ হইয়া চলিয়া গেল। সিদ্ধার্থ তখন হাঁসটিকে সযত্নে উড়াইয়া দিলেন।

গৌতমের আমোদ-প্রমোদ, খেলা-ধূলা এসব কিছুই ভাল লাগিত না। তিনি সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে মিশিতেন না। একা একা নির্জনে বসিয়া কি যেন ভাবিতেন, মাঝে মাঝে তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িত। শুদ্ধোদন পুত্রের ধরণধারণে ভয় পাইয়া গেলেন। সংসারে বন্দী করিবার জন্য একটি সুন্দরী রাজকন্যার সহিত তিনি গৌতমের বিবাহ দিলেন। দিনকতকের জন্য মনে হইল, বুঝি গৌতমের মতি ফিরিয়াছে।

ইহার কিছুদিন পরে একদিন গৌতম রথে চড়িয়া নগরের বাহিরে বাগানবাড়িতে আমোদ-প্রমোদের জন্য যাইতেছিলেন। নগরের তোরণে একজন জরাজীর্ণ বৃদ্ধকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহার মন বিষন্ন হইয়া গেল। সেদিন আর কোথাও যাইতে ইচ্ছা করিল না।

তিনি ফিরিয়া আসিলেন। গৃহে ফিরিয়া তিনিও ভাবিতে লাগিলেন যে, মানুষের পরিণাম তো এই! আজ তাঁহার দেহে যৌবনের এত লাবণ্য, কিছুদিন বাদে ঐ জরাজীর্ণ বৃদ্ধের দশা সকলেরই যেমন হয়, তাঁহারও তো তেমনই হইবে। তাই যদি হয়, তবে স্বাস্থ্য বা রূপযৌবনের অযথা গৌরব করিয়া কি হইবে?

আর একদিন অন্যপথ দিয়া নগরের বাহিরে যাইতে গিয়া তিনি দেখিলেন যে, একজন পীড়িত লোক ঠকঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে, বমি করিতেছে আর উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ করিতেছে। উহাকে দেখিয়া গৌতমের মন বিষন্ন হইয়া গেল। তাঁহার সেদিনও আর বাগানবাড়ীতে যাওয়া হইল না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, দেহধারণের এইতো পরিণাম! আজ সুস্থ সবল আছি, কাল আমার দশাও তো ঐরূপ হইতে পারে! যে কোন মুহূর্তেই যখন শরীরের ঐ দশা হইতে পারে, তখন আমোদ-প্রমোদ ভোগসুখ সম্ভোগ এই সমস্ত করিয়া কি হইবে?

আর একদিন তৃতীয় তোরণ দিয়া নগরের বাহিরে যাইতে গিয়া

গৌতম দেখিলেন যে, কতকগুলি লোক ভগবানের নাম করিতে করিতে একটি মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। কয়েকটি স্ত্রীলোক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে তাহাদের পিছু পিছু চলিয়াছে। এ দৃশ্য দেখিয়া গৌতমের মন আরও বিষণ্ণ হইয়া গেল।

তিনি বাগানবাড়ীর দিকে আর গেলেন না, গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। গৌতম ভাবিতে লাগিলেন যে, হায়, নরদেহের এই তো পরিণাম! শেষ পর্যন্ত সকলেরই এই দশা হইবে। যে কোন মুহূর্তেই যখন মৃত্যু আক্রমণ করিতে পারে, তখন এ জীবনের মূল্য কি? মানুষ কি করিয়া ভুলিয়া ভোগ-সুখে মগ্ন থাকিতে পারে?

আর একদিন চতুর্থ তোরণ দিয়া নগরের বাহিরে গিয়া গৌতম দেখিলেন যে, একজন মুণ্ডিতমস্তক সন্ন্যাসী গাছতলায় বসিয়া ভজন গাহিতেছেন। গৌতম তাঁহার সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ছন্দক, ঐ ব্যক্তি কে?"

ছন্দক বলিলেন; "কুমার, ঐ ব্যক্তি একজন সন্ন্যাসী। সংসারকে অসার জেনে ঐ ব্যক্তি সকল মায়া-মমতা কাটিয়ে সংসার পরিত্যাগ করে চলে এসেছেন। ওঁর কোন বন্ধন নেই, ওঁর কোন গৃহ নেই, আত্মীয়স্বজন কেউ নেই, ধনসম্পত্তিও নেই।"

কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সমস্ত ত্যাগ করে উনি এখন কি নিয়ে আছেন?"

ছন্দক বলিলেন, "কুমার, ইহলোক দু'দিনের জন্য; পরলোক-চির-কালের জন্য, এই কথা ভেবে ঐ ব্যক্তি পরলোকের চিন্তা নিয়ে রয়েছেন। কি করে জন্ম-মরণের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করবেন তিনি তাই চিন্তা করেন, তারই জন্য সাধনা করেন।"

কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে সাধনা কি?"

ছন্দক বলিলেন,—"সে সাধনা যে কি তা আমরা জানি না। উনিই বলতে পারেন। ওঁদের সঙ্গের সাথী না হলে সেকথা জানা যায় না।"

কুমার বলিলেন,—"ছন্দক রথ ফেরাও। আমি বাগানবাড়ীতে আর যাব না।"

গৌতম তখন চিন্তা করিতে লাগিলেন যে এজগতে এই সন্ন্যাসীই প্রকৃত সুখী। সন্ন্যাসী ঠিক পথই বাছিয়া লইয়াছেন। যে সংসারে এত দুঃখ, পীড়া, জরা, মৃত্যু ; সে সংসার ত্যাগ করাই তো উচিত।

এই দৃশ্যগুলি দেখিয়া গৌতমের মনে বৈরাগ্য জন্মিল, তিনি সংসার ত্যাগ করিবার সংকল্প করিলেন। এই সময় তাঁহার একটি পুত্রের জন্ম হইল। গৌতম দেখিলেন আর বিলম্ব করা সঙ্গত নয়, ক্রমেই বাঁধনের উপর বাঁধন বাড়িতেছে।

একদিন গভীর রাত্রিকালে গৌতম সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। পশ্চাতে পড়িয়া থাকিল তাঁহার রাজ্য, রাজধানী, রাজভাণ্ডার, রাজসুখ, অপূর্বসুন্দরী পত্নী, সদ্যোজাত পুত্র-সন্তান, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন। সকলের মায়াবন্ধন কাটাইয়া খাঁচার দুয়ার খোলাপাইয়া পাখী যেমন নীল আকাশে উড়িয়া যায়, তেমনই করিয়া তিনিও সংসারের বাহিরে চলিয়া গেলেন।

বৈশালী নগরে সন্ন্যাসীদের একটি মঠ ছিল। সেখানে বহু সন্ন্যাসী একত্রে মিলিয়া ধর্মের কথা লইয়া আলোচনা করিতেন। গৌতম সেখানে গিয়া আশ্রয় লইলেন। বড় বড় জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুক্তির উপায় কি ?"

তাঁহারা বলিলেন, "শাস্ত্র পড়, তা হলেই মুক্তির সন্ধান পাবে !"

গৌতম শাস্ত্র পড়িতে লাগিলেন, অল্পদিনের মধ্যে অনেক শাস্ত্র পড়িয়া ফেলিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার তৃপ্তি হইল না। তিনি দেখিলেন শাস্ত্র অনেক উপদেশ দেয়, কিন্তু আসল পথের নির্দেশ দিতে পারে না।

তিনি তখন গয়ার নিকটে উরুবিল্ব নামক স্থানে আসিয়া কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। তপস্যায় তাঁহার শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু তাহাতেও মুক্তির সন্ধান পাইলেন না। এইভাবে দীর্ঘকাল কাটাইয়া তিনি নৈরঞ্জনা নদীর ধারে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় পরম-ধ্যানে বসিলেন।

এই স্থানে ধ্যান করিতে করিতে হঠাৎ একদিন তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন। সেই জ্ঞানের দ্বারাই তিনি মানুষের মুক্তির সন্ধান পাইলেন।

বৌদ্ধগণ এই জ্ঞানকে বলেন 'বোধি'। যে স্থানে তিনি ঐ জ্ঞান লাভ করেন সে স্থানই বুদ্ধগয়া। যে বৃক্ষতলে তিনি সিদ্ধ হন সেই বৃক্ষকে বলা হয় 'বোধিদ্রুম'। এই বুদ্ধগয়ায় একটি বুদ্ধমন্দির আছে। বোধিত্ব লাভ করার পর গৌতমের নাম হইল বুদ্ধদেব বা বোধিসত্ত্ব এবং তথাগত।

বুদ্ধদেব এইবার তাঁহার নূতন ধর্ম প্রচার করিতে যাত্রা করিলেন। প্রথমে তিনি কাশীর নিকট মৃগদাব-সারনাথে তাঁহার ধর্মমত প্রচার করিলেন। বুদ্ধদেব ক্রমে মগধ, কোশল, কৌশাম্বী, বৈশালী ইত্যাদি বহুস্থলে তাঁহার ধর্মমত প্রচার করেন। বহু হিন্দু তাঁহার ধর্ম গ্রহণ করেন। অনেক রাজা তাঁহার ধর্ম গ্রহণ করিয়া আপন রাজ্যে যাগযজ্ঞ ও পশু বলি বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। অনেকে তাঁহার আহ্বানে সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলেন। তাঁহাদের জন্য নানা স্থানে মঠ (বিহার, সংঘারাম) স্থাপিত হইল। এই সকল মঠের সন্ন্যাসীকে শ্রমণ বা ভিক্ষু বলে। বুদ্ধদেব মঠে মঠে উপদেশ দিয়া বেড়াইতেন। এইভাবে ৪৫ বৎসর ধর্ম প্রচার করিয়া ৮০ বৎসর বয়সে কুশীনগর নামক স্থানে দেহরক্ষা করিলেন।

তখনকার লোকে বেদ মানিয়া চলিত। বুদ্ধদেব বলিতেন যে, বেদের শিক্ষা মানিয়া চলিলে সংসারে সুবিধা হইতে পারে, তাহাতে কিন্তু মুক্তি লাভ হইবে না।

তিনি বলিতেন যাগযজ্ঞ, পশুবলি, মন্দিরে মন্দিরে মূর্তিপূজা ইত্যাদির দ্বারা মুক্তি ঘটিবে না। মানুষ ক্রোধ, লোভ, লালসা, অহংকার, হিংসা ইত্যাদি কুপ্রবৃত্তির জন্যই দুঃখ পায়। এই সকলের জন্যই তাহারা বারবার জন্মগ্রহণ করে। জন্মগ্রহণ করিলেই রোগ, শোক, জরা, মরণের যাতনা সহ্য করিতে হয়। এইগুলি দূর করিতে পারিলে আর জন্ম হইবে না। ইহার নামই 'নির্বাণ' বা মুক্তি।

তিনি মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখিয়া মুক্তির সন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন মানুষের যত দুঃখ তাহা সে জন্মগ্রহণ করে বলিয়াই। মানুষ এক জন্মে যে পাপ করে পরজন্মে তাহারই ফলভোগ করে। এই পাপের মূল সংসারসুখ ভোগ করিবার লোভ বা কামনা। এই কামনা থাকিলেই তাহাকে আবার জন্মিতে হইবে এবং সর্বপ্রকার দুঃখ আবার

ভোগ করিতে হইবে। এই কামনা একে একে ত্যাগ করিতে হইবে। এই কামনা জয়ের নামই ধর্মাচরণ। যখন এই কামনা মনে একেবারেই থাকিবে না, তখন মৃত্যুর পর আর জন্ম হইবে না।

হিংসাই মহাপাপ। পশুবলি ছাড়া যাগযজ্ঞ হয় না, অতএব যাগযজ্ঞে পুণ্য হইতে পারে না। অহিংসাই পরমধর্ম। কর্মে, কথায় ও চিন্তায় হিংসা ত্যাগ করিলে মন পবিত্র হয়। মন পবিত্র হইলে সকল জীবকে ভালবাসিতে এবং সকলের যাহাতে মঙ্গল হয় তাহাই করিতে ইচ্ছা হইবে। কেবল মানুষ নয়, সকল জীবের মঙ্গল করা, সকল জীবের দুঃখ-ক্লেশ দূর করাই প্রকৃত ধর্ম।

ধর্মে সকলের সমান অধিকার, ধর্মের পথে জাতিকুলের বিচার নাই। নীচ কুলে বা অন্ত্যজ জাতিতে জন্মের জন্য কেহই ঘৃণার পাত্র নয়।

বুদ্ধের উপদেশ শুনিয়া অথবা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া বহু ধনী, শেঠ, বণিকেরা দান ধ্যান করিতে লাগিলেন। মানুষ ও জীবজন্তুর হিতের জন্য অনেক সৎকাজ করিতে লাগিলেন। শেষে মহারাজ অশোক ও হর্ষবর্ধনের প্রচেষ্টায় তাহা বিশ্বধর্মে পরিণত হইল।
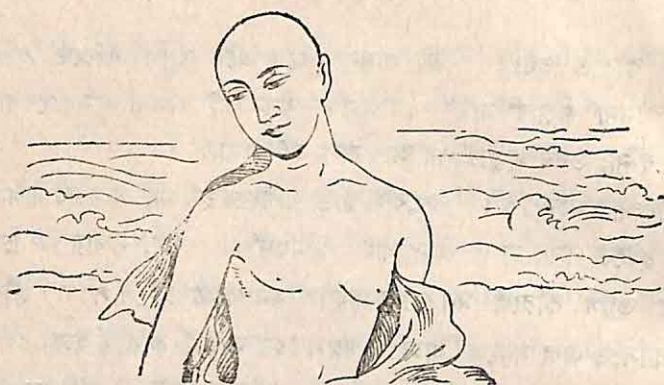
ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ফাল্গুনী পূর্ণিমার রাত্রিতে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব নবদ্বীপে ব্রাহ্মণবংশে শচীদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র। জগন্নাথ মিশ্রের আদিনিবাস ছিল শ্রীহট্ট। নবদ্বীপে তাঁহার শ্বশুরবাড়ি ; তিনি নবদ্বীপে স্থায়ীভাবে বাস করিতেছিলেন। যে সময় শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব হয়, সে সময়ে দেশের সামাজিক ও ধর্ম-জীবনের অবস্থা ছিল শোচনীয়।

লোকে প্রকৃত ধর্মের তত্ত্ব বুঝিত না। রাত্রি জাগিয়া মঙ্গলচণ্ডী ও মনসার পূজা করিয়া পালাগান শুনিত, বলিদান দিয়া পূজা করিত, মদ্য-মাংসে অনুরক্ত ছিল—জাত্যহঙ্কারে মত্ত হইয়া নিম্নশ্রেণীর লোকদের ঘৃণা করিত, অসার আচারপালনকে প্রকৃত ধর্ম বলিয়া মনে করিত। ঐহিক কামনাসিদ্ধির জন্যই দেবদেবীর পূজা করিত।

যাহারা জ্ঞানানুশীলন করিত তাহারা শুষ্ক পুঁথির পাতাতেই সারা-জীবন কাটাইয়া দিত, তর্কবিতর্ক করিয়া প্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টা করিত ; ভগবানের কথা ভুলিয়াও ভাবিত না। বৈষ্ণবগণ মনে করেন শ্রীঅদ্বৈতের আহ্বানে স্বয়ং নারায়ণ দেশের ধর্মসংস্কারের জন্য, প্রেম ও ভক্তিপ্রচারের উদ্দেশ্যে শ্রীচৈতন্য রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যের প্রকৃত নাম ছিল নিমাই বা বিশ্বম্ভর। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁহার নাম হইল শ্রীচৈতন্যদেব। শচীদেবীর বহু সন্তানের সূতিকা-গৃহেই মৃত্যু হয়। শ্রীচৈতন্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল বিশ্বরূপ। বিশ্বরূপ যৌবনে পাঠদ্দশাতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগ করেন।

নিমাই টোলে ভর্তি হইয়া পড়াশুনা আরম্ভ করিলেন। বিদ্যার্থী রূপে তিনি অসামান্য ধীশক্তির পরিচয় দিতে লাগিলেন। কিছুদিন বিদ্যা অনুশীলনের পর মাতাপিতা তাঁহার পড়াশুনা বন্ধ করিয়া দিলেন। এক পুত্র জ্ঞানী হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যান, নিমাইও পাছে বিদ্বান হইয়া সন্ন্যাসী হইয়া সংসার ত্যাগ করেন, এই ভয়ে জগন্নাথ মিশ্র নিমাইকে আর টোলে যাইতে দিলেন না। ফলে, নিমাই দুর্দান্ত হইয়া নবদ্বীপে নানাপ্রকার উপদ্রব আরম্ভ করিলেন। লোকজন নিমাই-এর অত্যাচারে বিব্রত হইয়া শচীদেবীর কাছে নিমাই-এর বিরুদ্ধে অবিরত অভিযোগ করিত। শাসন করিলে নিমাই বলিতেন—"আমাকে লেখাপড়া শেখাও না, কাজেই আমি এরূপ ব্যবহার করি। আমার অপরাধ কি?"

জগন্নাথ মিশ্র বাধ্য হইয়া নিমাইকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ভর্তি করিয়া দিলেন। নিমাই অল্পদিনের মধ্যেই বহু বিদ্যায় মহাপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি ব্যাকরণ, অলঙ্কার, বেদান্ত, ন্যায়, স্মৃতি এবং সাহিত্যের অনেক শাখাই আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। নিমাইয়ের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। বিদ্যা সমাপ্ত করিয়া তিনি নিজে চতুষ্পাঠী খুলিয়া ছাত্রগণকে পড়াইতে লাগিলেন। নানা দেশ হইতে তাঁহার টোলে ছাত্র আসিয়া ভিড় করিল। এবার শচীদেবী ছেলের বিবাহ দিলেন দরিদ্র ঘরের পরমাসুন্দরী কন্যা লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে।

এই সময়ে নিমাই পূর্ববঙ্গ পরিক্রমা করিতে যান। সেখানকার মানুষের হৃদয় জয় করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন তাঁহার পত্নী লক্ষ্মীদেবীর সর্পদংশনে মৃত্যু হইয়াছে। ইহাতে তিনি প্রচণ্ড শোক পাইলেন—কিন্তু মুহ্যমান হইলেন না। দ্বিগুণ উৎসাহে বিদ্যানুশীলনে

মন দিয়া শোক ভুলিতে চেষ্টা করিলেন। এই সময়ে শচীদেবী ছেলের আবার বিবাহ দিলেন ধনীকন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে।

নবদ্বীপ তখন সমগ্র বঙ্গদেশের শিক্ষাদীক্ষার প্রধান কেন্দ্রস্থল, এখানে দিগ্‌গজ পণ্ডিতের অভাব ছিল না। নিমাইপণ্ডিত সেই সব পণ্ডিতগণকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করিবার জন্য নানা কুপ্রশ্নের অবতারণা করিতেন; কুতর্কে সকলকে পরাজিত করিয়া রঙ্গরসিকতা করিতেন। পণ্ডিতেরা তাঁহাকে সবিশেষ ভয় করিয়া চলিতেন। তাঁহার কুপ্রশ্নের ভয়ে পণ্ডিতেরা নিমাইকে সযত্নে এড়াইয়া চলিত। সেকালের প্রথা অনুসারে তর্কযুদ্ধে পণ্ডিতদের হারাইতে পারিলেই দেশবিদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ হইত।

এই সময়ে কেশব কাশ্মীরী নামক এক দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত নবদ্বীপে আসিয়া নবদ্বীপের পণ্ডিতদের তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। পণ্ডিতেরা নিমাইকে আগাইয়া দিলেন। গঙ্গাতীরে কেশব কাশ্মীরীর সহিত নিমাই-এর প্রকাশ্যে তর্কযুদ্ধ আরম্ভ হইল। নিমাইয়ের অনুরোধে কেশব কাশ্মীরী একশত শ্লোকে গঙ্গার মহিমা বর্ণনা করিলেন। নিমাই প্রত্যেকটি শ্লোকেই অলঙ্কার-প্রয়োগের নানা দোষত্রুটি ধরিয়া কেশবকে অপদস্থ করিয়া দিলেন। নিমাই নবদ্বীপের মান রাখিলেন

নিমাই যখন পিতৃশ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানের জন্য গয়া গমন করেন, তখন সেখানে তিনি ঈশ্বরপুরী নামক একজন ভক্ত-সাধকের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরপুরী দশনামী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী হইলেও পরম জ্ঞানী ছিলেন। তাঁহার সাধুজীবন ভক্তির অপূর্ব বিকাশ দেখিয়া নিমাই-এর মতিগতি ফিরিয়া গেল। তিনি গোপালমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন। তখন দেখা গেল যে, সেই উদ্ধত পাণ্ডিত্যমত্ত নিমাইপণ্ডিত আর নাই! কৃষ্ণ-প্রেমাবেশে তিনি উম্মত্ত, অবিরল অশ্রুপাত করিতেছেন এবং অহরহঃ নাম কীর্তন করিতেছেন। ক্ষণে ক্ষণে ভাবাবেশ হইতেছে, বাহ্যজ্ঞান পর্যন্ত থাকে না। সকলে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। ছাত্রগণ এই ভাব দেখিয়া গ্রন্থে ডোর দিল—টোল উঠিয়া গেল।

নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রেমভক্তির অভাব ছিল। দুই-একজন যাঁহারা ভগবদ্ ভক্ত ছিলেন, যেমন মুরারী গুপ্ত, শ্রীবাস ইত্যাদি তাঁহারা

নিমাইয়ের এই অপূর্ব ভক্তির বিকাশে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার চরণে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। ক্রমে শান্তিপুর হইতে অদ্বৈত, বীরভূম হইতে নিত্যানন্দ আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলেন। নানা স্থান হইতে ভক্তগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীবাসের অঙ্গনে হরিনাম সংকীর্তন চলিতে লাগিল, হরিসংকীর্তনে নদীয়ায় প্রেমের বন্যা বহিল। এই সংকীর্তনই নিমাই-এর নবদ্বীপলীলার প্রধান অঙ্গ।

নবদ্বীপের ভট্টাচার্যগণ নিমাই পণ্ডিতের এই নাম সংকীর্তনকে বিষম উপদ্রব বলিয়াই মনে করিলেন। পাছে নদীয়ার লোক এই দিব্য উন্মাদের পাল্লায় পড়িয়া নিজেদের ইহপরকাল নষ্ট করে এই ভয়ে তাঁহারা কাজীর কাছে পর্যন্ত নালিশ করিলেন। কাজী কীর্তন বন্ধ করিয়া দিলেন।

শ্রীচৈতন্য নিষেধ শুনিলেন না। দল বাঁধিয়া নগরের পথে পথে সংকীর্তন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কাজী শ্রীচৈতন্যের লোকোত্তর ধর্মভাব ও ভাববিহ্বলতা লক্ষ্য করিয়া শেষ আর কোন বাধা দিলেন না। ভট্টাচার্যগণ তখন প্রমাদ গণিলেন; নিরুপায় হইয়া গালমন্দ করিতে লাগিলেন। নগর-কোটাল জগাই-মাধাই দুই ভাই ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াও মদ্য, গো-মাংস ইত্যাদি অখাদ্য ভোজন করিত, কোন ধর্মের ধার ধারিত না। তাহারা কীর্তন শুনিয়া ক্ষেপিয়া গেল—একদিন নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রচণ্ড প্রহার করিল। নিত্যানন্দ তাহাতে বিচলিত না হইয়া তাহাদিগকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিতে গেলেন। মহাপ্রভু তাহাদিগকে উপদেশ দিলেন। ইহার ফল ফলিল। তাহারা কুকর্ম ত্যাগ করিয়া পরম ভাগবত হইয়া উঠিল। নদীয়াবাসিগণ এই অঘটন দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমে এমন তন্ময় হইয়া পড়িলেন যে, আর তাঁহার সংসারে থাকা চলিল না। গৃহসংসার তাঁহার কাছে মায়া বন্ধন বলিয়া মনে হইল। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। কাটোয়ায় কেশব ভারতী নামক এক সন্ন্যাসীর নিকট সন্ন্যাসে দীক্ষা লইলেন।

শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে শোকসাগরে ভাসাইয়া নদীয়াবাসীর বুকে

শেল হানিয়া নিমাই নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া পুরীধামে চলিয়া গেলেন ; আর ফিরিলেন না, শান্তিপুরে গিয়া জননীর নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিলেন। এই দৃশ্য শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-যাত্রার ন্যায় করুণ। নিমাই-বিশ্বম্ভরের সন্ন্যাসাশ্রমের নামই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

পুরী হইতে শ্রীচৈতন্যদেব দক্ষিণাপথে প্রেমভক্তি প্রচার করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। রায় রামানন্দ ছিলেন পুরীর স্বাধীন-রাজা বিদ্যানগরের উপরাজ। দক্ষিণাপথ ভ্রমণকালে তাঁহার সহিত মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাৎকার বৈষ্ণব ধর্মজগতে একটি প্রধান ঘটনা। মহাপ্রভু রায় রামানন্দের সঙ্গে কৃষ্ণতত্ত্ব, প্রেমভক্তি তত্ত্ব ইত্যাদি লইয়া অনেক সময় আলোচনা করেন তাহার ফলে রায় রামানন্দ শ্রীচৈতন্যের চরণে শরণাগত হন এবং পুরীধামে অবশিষ্ট জীবন শ্রীচৈতন্যের সাহচর্যেই যাপন করেন।

ইহার কিছুকাল পরে তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। সেখানে তাঁহার অক্ষয় কীর্তি শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডের আবিষ্কার। বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে প্রয়াগে রূপ গোস্বামীর সঙ্গে এবং কাশীতে সনাতনের সঙ্গে মিলিত হন। গৌড়ের অধিপতি হোসেনশাহের আমাত্য রূপ ও সনাতন দুইজনেই মহাপণ্ডিত ছিলেন। মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের মর্ম তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহারাই মহাপ্রভুর প্রেমতত্ত্বের প্রকৃত ব্যাখ্যাতা।

শেষ আঠারো বৎসর মহাপ্রভু পুরীধামেই অতিবাহিত করেন। তিনি শেষজীবনে সর্বদা দিব্যজ্ঞানে বিভোর থাকিতেন। ক্বচিৎ কখনও তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিত।

চব্বিশ বৎসর কাল সন্ন্যাসজীবন যাপন করিয়া মহাপ্রভু আটচল্লিশ বৎসর বয়সে পুরীধামে দেহরক্ষা করেন।

শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণ তাঁহাকে স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া মনে করিতেন। সেজন্য তাঁহারা সর্বত্যাগ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আজিও বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে ভগবানের অবতারই মনে করেন।

চৈতন্যদেব মনে করতেন, সব মানুষই ঈশ্বরের সন্তান, তাই তিনি বলতেন প্রত্যেক মানুষেরই ঈশ্বরের আরাধনার অধিকার আছে। জাতি-ভেদ প্রথার তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন তাই দেখা যায় নীচ চন্ডালকেও তিনি বুকে টেনে নিয়েছেন, আবার প্রবল অত্যাচারী জগাই-মাধাইও তাঁর কৃপালাভ করেছিল। মনুষ্যত্বই ছিল তাঁর কাছে প্রধান ধর্ম। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি প্রচার করেছিলেন সহজ, সরল এবং সবার জন্য বৈষ্ণব ধর্ম, যে ধর্ম মানুষকে মানুষের আপন করে। মানুষের দুঃখে মানুষ কাঁদে তার সুখে নিজে সুখী হয় এবং সত্যিকারের মানুষে পরিণত হয়।

গুরু নানক

বালকটি পাড়ে দাঁড়াইয়া নদীতে লোকের স্নান করা দেখিতেছিল। উপবীতধারী ব্রাহ্মণেরা কোমর জলে দাঁড়াইয়া স্বর্গত পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করিতেছেন। অঞ্জলিভরা জল লইয়া চোখ বুজিয়া বিড়বিড় করিয়া কি যেন বলিতেছেন, এবং নদীর জল নদীতেই ফেলিয়া দিতেছেন।

তাহারা বহুক্ষণ ধরিয়া ঐভাবে তর্পণের নামে বৃথা সময় নষ্ট করিতেছে, আর মনে করিতেছে যে মৃত পিতৃপুরুষদের তৃষ্ণা দূর হইতেছে। বালকের মনে হইল যে, ইহা নিরর্থক আত্ম-প্রবঞ্চনা মাত্র!

বালকও অঞ্জলি ভরিয়া জল লইয়া তীরে বসিয়া তর্পণ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণরা তাহাতে কৌতুকবোধ করিল। একজন প্রশ্ন করিল—"ওহে মাটিতে জল ফেলে তুমি কি করছ?"

বালক গম্ভীরভাবে উত্তর করিল—"আপনারাই বা জল দিয়ে নদীতে কি করছেন?"

ব্রাহ্মণেরা সমস্বরে বলিল—"আরে তাও জানো না মূর্খ? আমরা তো পিতৃ-পুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণজল দিচ্ছি।"

সেই অকালপক্ক বালক তেমনই গম্ভীর স্বরে বলিল—"আমি আমার বাড়ীর পাশের সব্জির ক্ষেত্রে জলসেচন করছি।"

একজন ব্রাহ্মণ বালককে চিনিত, সে বলিল—"তোমার বাড়ীতো সেই তালবন্দী গাঁয়ে, তুমি এখান থেকে কি ক'রে সেখানে জলসেচন করছ? ভারি বোকা তো তুমি!"

বালক হাসিয়া বলিল—"আর আপনারা যে লোকান্তরের পিতৃপুরুষদের জল দিচ্ছেন তা কি করে পৌঁছাবে? এক ক্রোশ দূরের তালবন্দী গ্রামে যদি এ জল না যায়, পিতৃলোকে কি ঐ জল কখনও পৌঁছাতে পারে?"

ব্রাহ্মণরা বিরক্ত না হইয়া বালকের মুখে এই তত্ত্বকথা শুনিয়া বিস্মিত হইল। বালক আরও বলিল—"আপনারা এখানে পিতৃপুরুষদের জলদানের নামে ছেলেখেলা করে যে সময় ব্যয় করছেন, সেই সময় আপনারা যে কোন সংকর্মে ব্যয় করতে তো পারতেন।"

এই বালকের নাম নানক। যে শিখজাতি আজ অসামান্য শৌর্যবীর্যে নিজেদের কৃতিত্ব দেখাইয়া পৃথিবীর নানা রণক্ষেত্রে গৌরব লাভ করিয়াছে; উত্তরজীবনে তাহাদেরই ধর্মসম্প্রদায়ের প্রবর্তক হইয়াছিলেন এই বালক। শিখ ধর্ম, হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মাঝামাঝি।

লাহোরের নিকট তালবন্দী নামক গ্রামে ক্ষত্রিয়বংশে নানকের জন্ম হয়। নানক বাল্যকালে সংস্কৃত, পারসী ও উর্দু বেশ মন দিয়া পড়িয়াছিলেন এবং অল্পবয়স হইতেই বেশ কবিতা লিখিতে পারিতেন। কিন্তু পড়াশুনা অপেক্ষা ধর্মের দিকেই তাঁহার ঝোঁক ছিল বেশি। সুবিধা পাইলেই সাধু ফকিরদের সঙ্গে মিশিতেন এবং তাঁহাদের উপদেশ ও আলোচনা মনোযোগ সহকারে শুনিতেন।

পিতা দেখিলেন যে, পুত্র দিন দিন সংসারের অনুপযুক্ত হইয়া উঠিতেছে, দিনরাত কেবল ধর্ম ধর্ম করিয়া পাগল। পিতা তাঁহাকে একখানি দোকান করিয়া দিলেন এবং কতকগুলি টাকা দিয়া মালপত্র কিনিবার জন্য হাটে পাঠাইলেন।

পিতা তাঁহার স্বভাব জানিতেন। তিনি যাইবার সময় তাঁহাকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন—"এই টাকা দিয়ে হাট থেকে নুন কিনে পাশের গাঁয়ে তা বিক্রি করবে; দেখো যেন যে টাকাটায় নুন কিনছ তার চেয়ে বেশি দামে তা বিক্রি করতে পারো।"

নানক ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিলেন—"আজ্ঞে তাই করব।"

পিতা তবু তাঁহার উপর নির্ভর করিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার ভৃত্য বালাসিন্ধুকে ডাকিয়া বলিলেন—

"ওহে, তুমি নানকের সঙ্গে থেকো ও যেন ঠকে না আসে, লক্ষ্য করো।"

ভৃত্য নানকের সঙ্গে চলিল। নানক ব্যবসায়ে কিভাবে লাভ করিতে পারা যায় সেই কথা ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন। যাইতে যাইতে দেখিলেন গ্রামের প্রান্তে এক বৃক্ষের ছায়ায় পথের উপর একদল ফকির ক্লান্ত হইয়া বসিয়া আছেন। ফকিরদের সঙ্গে আলাপ করিয়া তিনি বুঝিলেন—তিনদিন হইতে তাঁহাদের খাওয়া হয় নাই। কথা বলিতেও তাঁহাদের বেশ কষ্ট হইতেছে। একথা শুনিয়া নানকের মনে দয়ার উদ্রেক হইল।

বালাসিন্ধুকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন—"দেখো, নুনের ব্যবসা না হয় আর ক'দিন পরে করলেও চলবে। কিন্তু সাধুদের আজ খেতে না দিলে তাঁরা হয়ত আজই মারা যাবেন। তুমি এই টাকা নিয়ে হাট থেকে আটা, ডাল, চিনি, ঘি কিনে আনো।"

বালাসিন্ধু সাধ্যমত নানককে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল, বলিল—"কিন্তু এ টাকা এভাবে আপনি নষ্ট করলে আপনার বাবা যে রাগ করবেন।"

নানক বলিলেন—"নুনের ব্যবসাতে আমার হয়ত কিছু লাভ হ'ত, কিন্তু সে টাকা আর কতদিন রাখতে পারব? কিন্তু সাধুসেবায় যে লাভ হবে, তা পরকালেও অক্ষয় থাকবে।"

এই বলিয়া তিনি সমস্ত অর্থ ব্যয় করিয়া সাধুদের আহারের ব্যবস্থা করিলেন এবং শূন্য হাতে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। নানকের পিতা তাঁহাকে ভং'সনা করিতে লাগিলেন।

পিতা—টাকাকড়ি নিয়ে হাটে গেলি তুই, কি লাভ করলি বল?
নানক—যে লাভ করেছি, ইহপরলোকে চিরদিন পাব ফল।
সাধুর সেবায় সকলি করেছি দান।
তার চেয়ে বাবা, এ জীবনে আর কিসে হব লাভবান?

বলা বাহুল্য, পাটোয়ার বাপ এই উক্তিতে খুশী হইলেন না। রাগ করিয়া নানককে দূর করিয়া দিলেন।

নানক তারপর ভগিনীর আশ্রয়ে গিয়া একটি মুদিখানার দোকান করিয়া রোজগার শুরু করিলেন এবং সংসারী হইলেন। ভগিনী তাঁহার বিবাহ দিলেন—দুটি পুত্রও তাঁহার হইল। কিন্তু তাহারাও তাঁহাকে সংসারের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না।

২৭ বৎসর বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তারপর নানা তীর্থ, নানা আশ্রম, মঠ ও সাধু-সন্তদের আস্তানায় আস্তানায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; সত্যধর্ম কোথাও দেখিলেন না। শেষে সাগরপার হইয়া মক্কা পর্যন্ত গেলেন। সেখানকার একটি ছোট ঘটনার কথা সকলেরই পরিচিত,—

কাবা-মসজিদ যেদিকে নানক সেদিকে পা দুটি থুয়ে
মক্কানগরে শ্রান্ত কাতর একদা ছিলেন শুয়ে।
মোল্লা আসিয়া গালি দিয়া কয়—"বেইমান, অমানুষ,
রেখেছিস্ পদ—কোন্ দিকে তার আছে কি খেয়াল হুঁস?"
জোড় হাতে ক'ন নানক তখন,—"হুজুর, শুনিতে চাই,
কোন্ দিকে রাখি চরণ যুগল, কোন্ দিকে তিনি নাই?"

নানক যেখানেই যান দেখিতে পান, ধর্মে ধর্মে রেষারেষি, এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে নিন্দা করে, লোকে আপন ধর্মমত লইয়া বড়াই করে এবং তাহা লইয়া অন্যের সঙ্গে লড়াইও করে। ধর্মের সার সত্যের খোঁজ কেহ বড় রাখে না, বাইরের ঘটা আড়ম্বর লইয়াই সকলে ব্যস্ত।

তখন তিনি নিজের ধর্মমত সকলকে শুনাইলেন। তাঁহার ধর্মের সার কথা অতি সহজ,—তাতে কোন জটিলতা নেই।

ঈশ্বর এক—তিনি হিন্দুরও ঈশ্বর, মুসলমানেরও ঈশ্বর। ধর্মে ধর্মে কোন তফাৎ নাই। যত তফাৎ ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানে। এগুলি অসার, অনাবশ্যক। সর্বজীবে প্রেম ও ভগবানের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও ভক্তি থাকিলেই হইল। ভক্তি না থাকিলে পূজার ঘটা করিয়া লাভ কি? সদ্গুরু চাই, যখনই কোন সন্দেহ হইবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।

বহু হিন্দু-মুসলমান এই ধর্মমত গ্রহণ করিয়া নানকের শিষ্য হইলেন—এই শিষ্যের দলই শিখজাতি গঠন করিল। ৭০ বৎসর বয়সে নানক দেহরক্ষা করেন।

মানবত্রাতা যীশুখৃষ্ট

বেথেলহেম হইতে কিছুদূরে নাজারেথ শহরে জোসেফ নামে এক দরিদ্র সূত্রধর বাস করিতেন। রাজার আদেশ অনুসারে জোসেফ তাঁহার স্ত্রী মেরীকে লইয়া নাজারেথ হইতে বেথেলহেম অভিমুখে যাত্রা করিলেন লোক-গণনায় হাজিরা দেওয়ার জন্য। কিন্তু বেথেলহেমে আসিয়া তাঁহারা দেখিলেন, সেখানে থাকিবার তিলার্ধ স্থান কোথাও নাই। সমস্ত সরাই-খানা ও পান্থশালা লোকে ভরিয়া গিয়াছে। এমন স্থান নাই, যেখানে আশ্রয় মিলিতে পারে।

খুঁজিতে খুঁজিতে জোসেফ একটি সরাইয়ের জীর্ণ আস্তাবল দেখিতে পাইলেন। সেই শীতের সময় অতখানি হাঁটিয়া আসার ফলে মেরী অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি আর চলিতে পারিতেছিলেন না। সেই ভাঙ্গা আস্তাবলের একপাশে জোসেফ এবং মেরী রাত্রির মত আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

রাত্রিতে কিন্তু তাঁহারা ঘুমাইতে পারিলেন না। মেরী আসন্নপ্রসবা ছিলেন। তাহার উপর পথের শ্রমে তিনি একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়া-ছিলেন। সেইখানে সেই জীর্ণ আস্তাবলের একপাশে শেষরাত্রিতে তিনি একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করিলেন।

দীন-দুঃখীদের মুক্তির বার্তা যিনি জগতে প্রচার করিয়াছিলেন, সেই যীশুখৃষ্ট এমনি দীনভাবে পৃথিবীর মাটিতে অবতীর্ণ হ'ন।

সেই প্রদেশের রাজা ছিলেন হেরড। তিনি তখন জেরুজালেম শহরে থাকিতেন। সহসা তাঁহার রাজদরবারে পূর্বদেশ হইতে কয়েকজন সাধু-পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের ধর্মশাস্ত্র বহুদিন হইতে এই আশ্বাসবাণী তাঁহাদের দিয়া আসিতেছে যে, অদূর-ভবিষ্যতে তাহাদের মধ্যে এক নূতন রাজা জন্মগ্রহণ করিবেন। তিনি জগতে এক পরম শান্তির বিধান আনিবেন, যাহার ফলে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। যে মুহূর্তে তিনি জন্মগ্রহণ করিবেন, সেই মুহূর্তে আকাশে এক নূতন তারকা তাঁহার আগমনবাণী প্রচার করিবে। তাই তন্দ্রাহীন নেত্রে তাঁহারা আকাশের দিকে চাহিয়াছিলেন। বহুদিন এমনি অপেক্ষা করিয়া থাকিতে থাকিতে আকাশে তাঁহারা সেই নব-তারার উদয় দেখিয়াছেন, এবং উহাকেই লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা জেরুজালেমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

রাজা হেরডকে সেই সাধুপুরুষগণ জানাইলেন যে, নিশ্চয়ই সেই ঈশ্বর-প্রেরিত পরমপুরুষ তাঁহারই রাজ্যে কোথাও-না-কোথাও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের সেই অপূর্ব কথা শুনিয়া রাজা হেরড বিস্মিত হইয়া গেলেন। সাধুপুরুষেরা আরও বলিলেন, সকল রাজার উপরে তিনি হইবেন রাজা। পৃথিবীর অন্য সব রাজার তরবারি তাঁহার অঙ্গুলি সঙ্কেতে ভাঙ্গিয়া মাটিতে পড়িয়া যাইবে।

রাজা হেরড মনে মনে ভীত হইয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন, সাধু-গণের কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সেই নূতন শিশু একদা তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে, তাঁহার রাজ্য ও রাজশক্তি সে কাড়িয়া লইবে। সেই ভয়ে সারা জেরুজালেম অনুসন্ধান করিবার জন্য তিনি লোক নিযুক্ত করিলেন। শেষকালে তিনি স্থির করিলেন, তাঁহার রাজ্যের মধ্যে যেখানে যত নবজাত শিশু আছে, তাহাদের তিনি হত্যা করিবেন।

সেই রাত্রে সহসা জোসেফ ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়া মেরীকে জাগাইলেন। স্বপ্নে দেবদূত আসিয়া তাহাকে বলিয়া গেলেন,—"জোসেফ,

তোমার এই শিশুকে নিয়ে এখনি এই রাজ্য ছেড়ে চ'লে যাও, নতুবা রাজার লোক এসে তোমার শিশুকে হত্যা করবে।"

স্বপ্নের কথা শুনিয়া মেরীর মাতৃ-হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহারা সেই রাত্রেই লুকাইয়া মিশরের দিকে যাত্রা করিলেন। এদিকে হেরডের লোকেরা রাজ্যের যেখানে যত নবজাত শিশু পাইল, তাহাদের সকলকে হত্যা করিল। মিশরে বসিয়া জোসেফ ও মেরী কম্পিত-অন্তরে সেই নিদারুণ সংবাদ শুনিলেন।

কিছুকাল পরে মিশরে যখন সংবাদ আসিল যে, দুর্দান্ত হেরড মরিয়া গিয়াছেন, তখন জোসেফ ও মেরী বালক যীশুকে লইয়া আবার নাজারেথে ফিরিয়া আসিলেন। জোসেফ সেখানে সূত্রধরের কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিলেন। বালক যীশুও পিতার নিকট বসিয়া সেই শিশুকালেই সূত্রধরের কাজ শিখিতে লাগিলেন। কিন্তু জোসেফ আর মেরী এক মুহূর্তের জন্যে বালককে চোখের আড়াল করিতেন না।

মাঝে মাঝে সেই বালক এমন সব জ্ঞানের কথা বলিতেন, জোসেফ ও মেরী যাহার মর্ম বুঝিতে পারিতেন না। কখনও বা বালক খেলাধুলা ছাড়িয়া একমনে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। মেরীর মাতৃ-হৃদয় অজানা আতঙ্কে ভরিয়া উঠিত। ভাবিতেন, বুঝি ছেলের উপর কোন অপদেবতা ভর করিয়াছে।

যীশু আপন মনে সারা দিন মাঠে-ঘাটে ঘুরিয়া বেড়ান। জেলে, মাঝিমাল্লা, চাষীদের সঙ্গে ঘুরিতে ভালবাসেন, ভিখারীদের সঙ্গে ভিক্ষায় বাহির হন, কে কোথায় সারাদিন উপবাসে আছে, কে কোথায় ব্যথায় কাঁদিতেছে, বালক সেইখানে তাহার পাশে গিয়া দাঁড়ান।

ক্রমশঃ কৈশোরকাল অতিক্রম করিয়া যীশু যৌবন লাভ করিলেন কিন্তু তাঁহার ভাবান্তর কিছুই ঘটিল না। সকল মানুষের মধ্যে তিনি ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেড়ান, অথচ যেন সকলের হইতে তিনি স্বতন্ত্র। নাজারেথে যত দীন-দুঃখী সকলেই তাঁহার বন্ধু। তাহাদের কানে কানে কি সব আশার কথা তিনি বলিতেন।

যে উপবাসী, তাঁহাকে বলেন,—"তোমার উপবাসের মধ্যে তোমার

ভগবানও উপবাসী আছেন, দুঃখ করো না!" বেদনায় যে কাঁদে, তাহার কাছে গিয়া বলেন,—"তুমি ধন্য, তোমাকে তিনি অশ্রুজলে স্নান করিয়ে দিয়েছেন।" যে প্রতিবেশী ক্রোধে অন্য প্রতিবেশীর ক্ষতি করতে চায়, যীশু তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলেন,—"না, আঘাতের বদলে অমন ক'রে আঘাত দিতে নেই।"

সকলেই বিস্মিত হইয়া ভাবেন,—"নাজারেথের পথে-প্রান্তরে কোথা থেকে এল, এই ক্ষেপা পাগল!"

কোন নীচ কাজ করিতে, কোন বস্তুতে লোভ করিতে বা কখনও ক্রোধ প্রকাশ করিতে, নিজের সুখ-সুবিধার জন্য কোন কিছু করিতে তাঁহাকে কেহই দেখে নাই। কিন্তু একদল লোক তাঁহাকে খুব ভাল চোখে দেখিলেন না। তাঁহারা পুরোহিত শ্রেণীর লোক, আনুষ্ঠানিক ধর্মের ভার ছিল তাঁহাদের হাতে। যীশু তাঁহাদের কাছে গিয়া বলিলেন,—"নীচ কাজ ক'রে শুধু আচার-বিচারের খুঁটিনাটির দ্বারা মামুলি অনুষ্ঠান দিয়ে কেউ কি তাঁকে ভোলাতে পারে?"

যীশুর এই স্পষ্ট কথায় তাঁহারা চটিয়া উঠেন; তাঁহারা মনে করেন, এই যুবক তাঁহাদের পূজা-পদ্ধতি ও রীতি-নীতিকে বিদ্রূপ করিতেছেন। এমন সময় সহসা কিছুকালের জন্য সেই অদ্ভুত পাগলকে আর দেখা গেল না। দরিদ্র-আতুর লোকেরা তাঁহাকে হারাইয়া হাহাকার করিয়া উঠিল। তাহাদের মনে হইল, তাহারা যেন অসহায় হইয়া পড়িয়াছে, পালক-হারা মেষপালের মত। পূজারী পণ্ডিতেরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন,—"যাক, আপদটা বিদায় নিয়েছে!"

কেহই সেদিন তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইল না, কোথায় পাগল চলিয়া গেলেন। আজ পর্যন্ত কেহই তাহা জানে না। অনেকে অনুমান করেন, এই সময় তিনি গভীর সাধনায় মগ্ন ছিলেন এবং সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি যখন আবার লোক-সমাজে দেখা দিলেন, তখন তাঁহার মুখে-চোখে-কথায় এক দিব্য-ভাব প্রভাত-আলোকের মত উজ্জ্বল হইয়া আছে!

নির্জনবাস হইতে ফিরিয়া আসিয়া যীশু সোজা নিজের গ্রাম নাজারেথে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, মানুষ সত্যই মানুষকে

ভালবাসিতে ভুলিয়া গিয়াছে। তাই তিনি আর ঘরে ফিরিলেন না, পথে পথে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন,—"সকলকে ভালবাস···যে আঘাত করেছে, তাকে আহত ক'রে আর ভগবানের বুকের বোঝা বাড়িয়ে দিও না!"

দীনদরিদ্র লোকেরা তাহাদের আপন মানুষটিকে আবার নিজেদের মধ্যে ফিরিয়া পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই পথে পথে ঘুরিতে লাগিল। যেখানে মানুষের সেবার প্রয়োজন, যেখানে ক্ষুধিতের মুখে অন্নের প্রয়োজন, যীশু তাঁহার সঙ্গীদের লইয়া সেইখানেই যান। দেখিতে দেখিতে লোকের মুখে মুখে যীশুর কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তাহারা যেন এতদিন পরে আশ্রয় পাইল···অকুল পাথারে ভেলা পাইল। কিন্তু নাজারেথ গ্রামের পুজারী পণ্ডিতরা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। একটা সূত্রধরের ছেলে কিনা ধর্ম-প্রচার করিয়া বেড়াইবে, আর লোকে মন্দিরে না আসিয়া, তাহারই পিছু পিছু ছুটিবে? এ অনাচার অসহ্য! সূত্রধর-পুত্রের উচিত সূত্রধরের মত থাকা। তাই তাঁহারা সকলেই যীশুকে তিরস্কার করিলেন।

যীশু হাসিয়া বলিলেন,—"আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন, তিনি আমাকে এই কাজ করতেই যে বলেছেন।"

পণ্ডিতেরা তাঁহার উত্তর শুনিয়া আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। একদিন তাঁহারা সকলে পরামর্শ করিয়া গায়ের জোরে নাজারেথ হইতে অপমান করিয়া যীশুকে বাহির করিয়া দিলেন। যীশু কোন কিছু বলিলেন না, দুই হাত আকাশের দিকে তুলিয়া শুধু জানাইলেন,—"তুমি এদের অপরাধ নিও না—এরা তো জানে না যে, তুমিই আমাকে পাঠিয়েছ!"

নিজের গ্রাম হইতে বিতাড়িত হইয়া যীশু জেনেসারেথ হ্রদের ধারে এক লতাকুঞ্জে বাস করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পর তাঁহার অনুচরেরাও তাঁহাকে ছাড়িয়া আর থাকিতে না পারিয়া সেখানে আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। পিটার এনড্রু, জন, জেমস্ তাঁহারা—কেহ ছিলেন জেলে, কেহ ছিলেন মাঝি। মাছ ধরা, নৌকা-চালানো তাঁহাদের আর

ভালো লাগিল না। সেই পাগল মানুষটি যেন তাঁহাদের মধ্যে কি একটা ভাব জাগাইয়া দিয়াছেন। তাঁহারা ছুটিয়া সেই জনহীন হ্রদের ধারে তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেই হ্রদের চারিদিকে গ্রাম ও নগর গড়িয়া উঠিল। যীশু স্থির করিলেন, যেখানেই থাকিবেন, সেখান হইতে প্রতিদিন গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে গিয়া যে শুভ-সমাচার তিনি অন্তরে বহন করিয়া আনিয়াছেন, তাহা সকলকেই জানাইবেন।

এই সময় তাঁহার এমন অলৌকিক ক্ষমতার আবির্ভাব হইয়াছিল যে, তাঁহার স্পর্শে রোগী রোগমুক্ত হইত, অন্ধ তাহার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইত, যে পঙ্গু, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, সে আবার সবল-সুস্থ হইয়া উঠিত। যখন লোকে এমন ভগবৎপ্রেরিত লোকটির সংবাদ পাইল, তখন তাহারা দলে দলে দেশ-দেশান্তর হইতে সেই নির্জন স্থানে সমবেত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সেই নির্জন হ্রদের তটভূমি মনুষ্যের কলকোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল। তাহাদের মধ্যে তিনি সহজ সরল ভাষায় যে ধর্মের বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন, তাহার মধ্যে কোন আড়ম্বর ছিল না, কোন মন্ত্রতন্ত্র ছিল না, কোন ব্রত-উপবাসের বিধিবিধান ছিল না।

ক্রমে যীশুর শিষ্য ও সহচরের সংখ্যা যখন খুব বাড়িয়া গেল তখন যীশু ঠিক করিলেন যে, তাঁহার সেই অসংখ্য শিষ্যের মধ্য হইতে তিনি মাত্র বারোজনকে নির্বাচিত করিবেন। এই বারো জনকে তিনি দেশ-দেশান্তরে পাঠাইবেন, শুভ-সমাচারের কথা দূর-দূরান্তের লোকের কাণে ও প্রাণে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য। যীশুর নির্বাচিত সেই বারোজন শিষ্যের নাম—সাইমন, পিটার, এনড্রু, জেবেদির পুত্র জেমস্, জন, ফিলিপ, বার্থোলোমিউ, ম্যাথু টমাস, আলফিয়সের পুত্র জেমস্, লেবিয়াস সাইমন এবং জেমসের ভাই জুডাস ইস্কারিয়ট।

একদিন শিষ্যদের সকলকে ডাকিয়া তিনি অভয়-মন্ত্র দিয়া বলিলেন,—"যারা তোমাদের আঘাত করবে, তোমাদের দেহ বিনাশ করতে আসবে, তাদের জন্য ভীত হয়ো না—দেহের মৃত্যু, মৃত্যু নয়"—

তিনি সেই বারোজন শিষ্যকে আরও কিছুকাল তাঁহার নিকট রাখিয়া দিলেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে লইয়া প্যালেস্টাইনের পথে-প্রান্তরে ঘুরিয়া শুভ-

সমাচার প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এদিকে একদল লোক দূর হইতে নীরবে যীশুকে লক্ষ্য করিতেছিল, যীশু সেদিকে খেয়াল রাখেন নাই। তাহারা ছিল ধনী ইহুদী। এই ধনী ইহুদীরা সাধারণ লোকের উপর যীশুর প্রভাব দেখিয়া আতঙ্কিত হইয়া উঠিল—এবং তাহারা বলিতে লাগিল,—"যীশু ইহুদীদের প্রচলিত পূজা-পদ্ধতি মানে না—এবং সকলের উপর, লোকটা ধর্মদ্রোহী—কারণ, "সে লোকের কাছে বলে বেড়াচ্ছে যে, ইহুদী সাধকেরা পয়গম্বরের মহা-আবির্ভাবে যে প্রত্যাশার প্রতীক্ষা করছিলেন, তা সফল করবার জন্যই সে এসেছে।"

অতঃপর নানাভাবে যীশুকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। কিন্তু যীশু তাহার কোন প্রতিবাদই করিলেন না। তিনি আপনার মনে দীন-দরিদ্র আতুরদের মধ্যে প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন,—"দুঃখ পেয়েছ বলে দুঃখ করো না। কারণ, তোমাদের জন্য খোলা আছে স্বর্গের দ্বার; দুঃখ দিয়েই তিনি তোমাদের তাঁর আপন জন বলে চিহ্নিত করেছেন।"

ধনী ইহুদীরা কিন্তু সেই আশ্বাস-বাণীর মধ্যে বিদ্রোহের বার্তা শুনিতে পাইল। তাহারা মনে করিল, যীশু তাহাদের ঐশ্বর্যের জন্য হিংসা-বশতঃ তাহাদের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উত্তেজিত করিতেছে।

এদিকে দলে দলে লোক যীশুর শিষ্য হইতে লাগিল। তিনি সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—"রাজার কর যদি দিতে হয়, যিনি সকল রাজার রাজা তাঁকে দিবে। আমি তাঁর প্রতিনিধিরূপে তোমাদের কাছে সেই কর চাইতে এসেছি।" এই প্রচার-বাণীর মধ্যে বিরুদ্ধবাদীরা রাজদ্বারে অভিযোগ করিবার সুযোগ পাইল।

সেই সময় প্যালেস্টাইন রোমান শাসকদের অধীন ছিল। রোমান-আইন অনুসারে তাঁহারা প্রজাদের ধর্ম-সংক্রান্ত বিষয়ে কোন রকম হস্তক্ষেপ করিতেন না। সেইজন্য ধর্মদ্রোহী বলিয়া যীশুকে রাজদ্বারে অভিযুক্ত করা চলিত না। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীরা যখন শুনিল যে, যীশু লোকদের বলিয়া বেড়াইতেছেন রাজার কর যদি দিতে হয়, তবে যিনি সকল রাজার রাজা, তাঁহাকেই দিবে, তাহারা তখন এক মহা সুযোগ পাইল, তাহারা বুঝিল যে,

যীশু রোমান-শাসকদের কর দিতে বারণ করিতেছেন এবং নিজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। এই ঘোরতর রাজদ্রোহের শাস্তি হইল ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া প্রাণহরণ। তাহারা সকলে মিলিয়া রোমান শাসকদের প্রতিনিধির নিকট গিয়া যীশুর বিরুদ্ধে সেই রাজদ্রোহের অভিযোগ আনিল। কিন্তু তাহার প্রমাণ কোথায়? অর্থের লোভে তাঁহার সেই বারোজন অনুচরের মধ্যে একজন, জুডাস ইস্কারিয়ট, যীশুর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত হইল।

যীশু তখন ধর্ম প্রচার করিতে করিতে রাজধানী জেরুজালেম অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। বেথেনী শহর অতিক্রম করিয়া জেরুজালেমে প্রবেশ করিবার মুখে তিনি তাঁহার একজন শিষ্যকে ডাকিয়া বলিলেন—"ঐ সামনের গ্রামে গিয়ে দেখবে, এক গাছের তলায় একটি গর্দভ বাঁধা আছে। সেটার বাঁধন খুলে এখনি এখানে নিয়ে এস। লোকে জিজ্ঞাসা করলে বলবে, প্রভুর প্রয়োজন।"

অনুচরেরা গ্রামে প্রবেশ করিয়া দেখিল, যীশুর কথামত গাছতলায় একটি গর্দভ বাঁধা রহিয়াছে। তাহারা বাঁধন খুলিয়া গর্দভটিকে লইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে যীশুর আগমনবার্তা ছড়াইয়া পড়িল। দলে দলে লোক যেখানে যীশু অপেক্ষা করিতেছিলেন সেখানে আসিয়া সমবেত হইল।

সমবেত জনগণ নিজেদের গায়ের কাপড় গর্দভের পিঠে বিছাইয়া দিল এবং পাম গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া বাহনটিকে সাজাইল। সকলে মিলিয়া আনন্দধ্বনি করিতে করিতে যীশুকে তাহার উপর বসাইল। কেননা তাহারা মনে-প্রাণে বুঝিয়াছিল, তাহাদের উদ্ধারকর্তা, তাহাদের হৃদয়ের রাজা আসিয়াছেন। তাই তাহারা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল—"জয় তোমারই জয়, হে আমাদের নূতন রাজা।"

পথের দুইধারে কাতারে কাতারে লোক ভিড় করিল। তাহাদের মধ্যে কেহ অন্ধ, কেহ খঞ্জ, কেহ ব্যাধিগ্রস্ত। যীশু পরম আগ্রহে সকলকে আলিঙ্গন দিতে দিতে আগাইয়া চলিলেন। সেই স্পর্শে লোকের দেহে-মনে স্বর্গীয় শিহরণ জাগিয়া উঠিল। তাহারা নূতন মানুষ হইয়া গেল।

যীশুর নিষ্পাপ মন ভবিষ্যতের সমস্ত ঘটনা চোখের সামনে দেখিতে পাইল। কিন্তু তিনি তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। আনন্দরসে তাঁহার চিত্ত উদ্বেল হইয়া উঠিল। কারণ, ভগবান সেই মহাবেদনা-বরণের জন্য তাঁহাকেই চিহ্নিত করিয়াছেন।

গেথসিমানির উপবনে যাইবার পথে তিনি শিষ্যদের লইয়া ভোজনে বসিলেন। তিনি জানিতেন সেই তাঁহার শেষ ভোজন। ভোজনান্তে তিনি শিষ্যদের ডাকিয়া বলিলেন,—"আজ রাতে তোমরা কেউ আমার কাছে থেকো না, আমি একা থাকব।"

পিটার কাঁদিয়া বলিলেন,—"কারাগারে যেতে হয়, যদি মরতে হয়, তবুও তোমাকে ছাড়ব না প্রভু।"

যীশু হাসিয়া বলিলেন,—"কিন্তু আমি জানি পিটার, আজ রাত্রিশেষে সূর্যোদয়ের পূর্বেই তুমি তিনবার আমাকে দেখেও চিনতে পারবে না!"

পিটার যীশুর মুখে সেই কথা শুনিয়া ভাবিয়া স্থির করিতেই পারিলেন না, কেন যীশু এই কথা বলিলেন।

সেই দিন রাত্রিতে সহসা সেই নির্জন উপবন মশালের আলোয় আলোকিত হইয়া উঠিল। শিষ্যেরা সকলে সচকিত হইয়া উঠিলেন। ক্রমশঃ সেই মশালের আলোয় তাঁহারা দেখিলেন, সৈন্য-সামন্ত লইয়া ইহুদী-দের প্রধান পুরোহিত সেইদিকে অগ্রসর হইতেছেন।

ইহুদীদের আসিতে দেখিয়া জুডাস ইস্কারিয়ট তাড়াতাড়ি যীশুর পদ-চুম্বন করিলেন। কারণ, আগে হইতেই জুডাস ঠিক করিয়া আসিয়া-ছিলেন যে, তাহারা উপস্থিত হইলে পদ-চুম্বন করিয়া তিনি দেখাইয়া দিবেন, কোন্ জন যীশু!

জুডাসের সেই আকস্মিক পদ-চুম্বনে যীশু হাসিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন,—"এমনিভাবে চুম্বন করে কি ঈশ্বরের সন্তানকে প্রতারণা করতে হয়?"

এদিকে প্রধান পুরোহিতের ইঙ্গিতে রোমান সৈনিকরা অগ্রসর হইয়া আসিয়া যীশুর হাত-পা বাঁধিয়া ফেলিল। সেই অবসরে তাঁহার সমস্ত শিষ্যেরা অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া রহিলেন।

অতঃপর রোমানগণ যীশুকে বাঁধিয়া লইয়া গেল! যখন রোমান-শাসকের কাছে এই সংবাদ পৌঁছিল, তখন তিনি তাঁহার শয্যায় নিদ্রামগ্ন। লোকের চীৎকার শুনিয়া তিনি বিরক্ত হইয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, একজন নিরীহ লোককে হাত-পা বাঁধিয়া তাঁহার নিকটে আনা হইয়াছে। কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই জনতা চীৎকার করিয়া উঠিলেন,— "আমরা বিচার চাই—মৃত্যুদণ্ড।"

—"কি অপরাধে?"

—"সে রাজদ্রোহী; সে সর্বত্র নিজেকে রাজা ব'লে ঘোষণা করে বেড়াচ্ছে!"

জনতার সেই কথা শুনিয়া রোমান-শাসক হাসিয়া উঠিলেন। সেই নিরীহ নিরস্ত্র লোকটিকে সহসা রাজদ্রোহের অপরাধে তিনি কি করিয়া মৃতুদণ্ড দিবেন! কিন্তু ক্ষিপ্ত ইহুদী জনতা তাঁহার কোন কথাই শুনিল না। তাহারা সমস্বরে সেই লোকটির মৃত্যুদণ্ড বার বার দাবি করিতে লাগিল।

রোমান-শাসক দেখিলেন, একটি নগণ্য জীবন রক্ষা করিতে গিয়া হয়ত তাঁহাকে একটা বৃহৎ গণ-বিপ্লবের সম্মুখীন হইতে হইবে। সুতরাং, নিতান্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও রোমান-শাসক ইহুদী পুরোহিতদের দাবিমত যীশুর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। রাজদ্রোহীর শাস্তি ক্রুশে দাঁড় করাইয়া দিয়া সেই ক্রুশের কাঠের সঙ্গে দেহকে বিদ্ধ করিতে হইবে, যতক্ষণ না প্রাণ যায়।

প্রাণদণ্ডের আদেশ শুনিয়া জনতা উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল, হাতের কাছে যে যাহা পাইল, তাহা দিয়া শেষবারের মত মনের সাধে যীশুকে আঘাত করিল।

অতঃপর রোমান-সৈনিকেরা যীশুকে বধ্য ভূমিতে লইয়া গেল। কিন্তু তাঁহার মুখে কোন খেদের চিহ্ন নাই, তাঁহার কণ্ঠে কোন অভিযোগের ভাষা নাই।

সৈনিকেরা শুনিয়াছিল, যে লোকটিকে বধ্যভূমিতে তাহারা লইয়া চলিয়াছে, সে নাকি নিজেকে সীজার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। তাই রঙ্গ করিবার জন্য তাহারা তাঁহার মাথায় কাঁটা-লতার মুকুট পরাইয়া দিল,

তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র কাড়িয়া লইয়া রোমের সীজারগণ যে রক্তবর্ণের বসন পরেন, সেইরূপ একটি জীর্ণ বসন তাঁহাকে পরাইয়া দিল। তারপর ব্যঙ্গ করিয়া বলিল,—"চল রাজা, তোমাকে তোমার সিংহাসনে নিয়ে যাই!"

সেকালে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া যে অপরাধীদের প্রাণদণ্ড দেওয়া হইত, তাহাদের জন্য সেই বর্বর আইনের প্রবর্তকরা দয়াপরবশ হইয়া একপ্রকার বিষাক্ত পানীয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বধ্য ভূমিতে লইয়া যাইবার পূর্বে দণ্ডিত ব্যক্তিকে সেই পানীয় পান করিতে দেওয়া হইত। তাহার ফলে সেই ব্যক্তির বেদনাবোধ সাময়িকভাবে ঘুচিয়া যাইত। যীশুকে রাজার সাজে সাজাইয়া সৈনিকেরা যথারীতি সেই পানীয় যীশুর সম্মুখে আনিয়া ধরিল।

যীশু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কি হবে?"

—"পানীয় পান করলে, আঘাতের বেদনা বোধ হবে না।"

যীশু হাসিয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন।

বিস্মিত হইয়া সৈনিকেরা তাঁহাকে বধ্যভূমিতে লইয়া চলিল।

ইতিমধ্যে তাঁহার সেই বারোজন ভক্ত শিষ্য সকলেই সরিয়া পড়িয়া-ছিলেন।

যীশু ঠিক যেমনটি বলিয়াছিলেন, তেমনটিই ঘটিয়াছিল। পিটার এই সময় ধরা পড়িবার ভয়ে দুইবার জনতার আড়ালে আত্মগোপন করিয়া-ছিলেন। কিন্তু সকলে যখন চলিয়া গেল, তিনি পথের একধারে তখনও দাঁড়াইয়া ছিলেন। অসহ্য অনুশোচনায় তাঁহার মর্মস্থল পর্যন্ত জ্বলিয়া যাইতেছিল।

সহসা সৈনিকদের সঙ্গে যীশুকে সেইপথে আসিতে দেখিয়া আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রেরণায় পিটার পুনরায় আত্মগোপন করিলেন। যীশুর ভবিষ্যদ্-বাণী এমন করিয়া সফল হইল ভাবিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।

এদিকে কোন কিছু লক্ষ্য না করিয়া যীশু একাকী বধ্যভূমির দিকে আগাইয়া চলিলেন। বধ্যভূমিতে তখন শুধু একটি চোরের ক্রুশবিদ্ধ

শবদেহ। তাহারই পাশে আর একটি ক্রুশে যীশুকে ঝুলানো হইল। রোমান সৈনিকরা পেরেক আর হাতুড়ি লইয়া তাহাদের কাজ আরম্ভ করিল। জীবন্ত মানুষের দেহে লোহার পেরেক বিঁধিতে লাগিল। ছিদ্রমুখে রক্ত ঝরিয়া পড়িল। সে রক্তধারা আজিও মানবজাতির হৃদয়কে বেদনায় সিক্ত করিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু যাঁহার দেহ বাহিয়া আঘাতে আঘাতে রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছিল, তাঁহার মুখে বেদনার কোন চিহ্ন নাই! করুণার দীপশিখা নীলাভ নয়নে তখনও তেমনি জ্বলিতেছে! ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে দুইটি হাত জোড় করিয়া শুধু বলিলেন,—"হে প্রভু, হে পিতঃ, তুমি ইহাদের ক্ষমা কর। ইহারা জানে না, ইহারা কি করিতেছে!"

নাজারেথের সেই দরিদ্র সূত্রধরের ছেলে জগৎ হইতে এইভাবে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন।

যাঁহার জন্য ইহুদীরা যুগ-যুগান্তর ধরিয়া অপেক্ষা করিয়াছিল, তিনি যখন আসিলেন, তখন তাঁহাকে তাহারা চিনিতে পারিল না, এমনি করিয়া নিদারুণভাবে লাঞ্ছিত করিয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিল।

ইহুদীরা ধনে-মানে অনেক বড় হইয়াও আজ পর্যন্ত সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে।

কোরেশ বংশের বৃদ্ধ আবদুল মোতালেব পাগলের মত একা একা মরুভূমির চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি পণ করিয়াছেন, খুঁজিয়া বাহির করিবেন, কোথায় মাটির তলায় লুকাইয়া আছে আছে জমজম্ উৎস।

মক্কা-তীর্থে প্রতি বৎসর যে-সব যাত্রী আসেন, মোতালেবের কাজ ছিল তাঁহাদের তৃষ্ণার জল সরবরাহ করা। কিন্তু মরুভূমির দেশে তখন সুপেয় জলের একান্ত অভাব ছিল। তৃষ্ণার জ্বালায় যাত্রীরা অসহ্য বেদনা পাইত। সেই বেদনা দূর করিবার জন্যই মোতালেব উৎস-সন্ধানে বাহির হইয়াছেন।

কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টাতেও কোথাও সে উৎসের সন্ধান মিলিল না। তখন হতাশ হইয়া মোতালেব প্রতিজ্ঞা করিলেন, যদি তিনি সে উৎসের সন্ধান পান, তাহা হইলে তাঁহার নিজের পুত্রকেও কোরবানি করিতে রাজী। জগদীশ্বর সে-কথা শুনিলেন। মোতালেব উৎসের সন্ধান পাইলেন। কিন্তু নিজের প্রতিজ্ঞার কথা ভুলিলেন না। পুত্র আবদুল্লাহ্কে তিনি কোরবানি দিবার জন্য পাষাণে বুক বাঁধিলেন। কিন্তু মৌলবীরা আসিয়া বাধা দিলেন। শাস্ত্র ঘাঁটিয়া তাঁহারা বিধান দিলেন, একশত পশু কোরবানি করিলেই চলিবে। আবদুল্লাহের জীবন রক্ষা পাইল। সেই অমূল্য জীবন রক্ষা করা জগদীশ্বরেরও অভিপ্রেত ছিল।

কালক্রমে আবদুল্লাহের একটি পুত্র হইল। কিন্তু পুত্রটি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া পিতার মুখ দেখিতে পাইলেন না। পুত্র যখন মাতৃগর্ভে, তখন আবদুল্লাহ্ প্রবাসে প্রাণত্যাগ করেন।

ইসলাম ধর্মের প্রধান প্রচারক পয়গম্বর হজরৎ মোহম্মদ এইভাবে আবির্ভূত হন।

সে সময় সম্ভ্রান্ত আরবদের মধ্যে একটা রীতি ছিল যে, পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে, তাহাকে গৃহে রাখা হইত না। লালন-পালনের জন্য শিশুকে কোন ধাত্রীর গৃহে পাঠাইয়া দেওয়া হইত। সেই রীতি-অনুসারে শিশু মোহম্মদকে ধাত্রী হালিমার নিকট লালন-পালনের জন্য পাঠানো হইল। দুই বৎসর শিশু মোহম্মদ হালিমার বুকে রহিলেন। এই শিশুকে মাতৃ-ক্রোড়ে ফিরাইয়া দিতে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। বহু শিশুকে তিনি এমনি লালন করিয়া আবার মাতৃ-ক্রোড়ে ফিরাইয়া দিয়াছেন, আজ কেন এই শিশুকে ফিরাইয়া দিতে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে। জননী আমিনাকে বলিয়া তিনি শিশু মোহম্মদকে আবার তাঁহার নিকটে লইয়া আসিলেন। এই সময় হালিমা দেখিলেন, কোথাও কিছু নাই, শিশু মাঝে মাঝে ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়েন। ইহাতে হালিমার মাতৃ-হৃদয় অজানা আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠে। আরবের লোকেরা এই সময়ে ভুতপ্রেতে বিশ্বাস করিত। তাই হালিমার মনে হইল, শিশুর দেহে ভৌতিক আবেশ হইয়াছে!

অতঃপর ছয় বৎসর বয়সে শিশু মোহম্মদ ধাত্রী হালিমার ঘর হইতে মাতৃ-ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিলেন।

প্রতিদিন আমিনা সন্ধ্যাকালে স্বামীর সমাধিস্থলে গিয়া নীরবে অশ্রু-বিসর্জন করিতেন। শিশু প্রতিদিন এই দৃশ্য দেখিতেন। তাঁহার শিশুহৃদয় শোকে ভরিয়া উঠিত। একদিন তিনি কাতরভাবে জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা, তুমি রোজ কাঁদ কেন?"

পুত্রের বার বার কাতর অনুরোধে আমিনা বলিলেন,—"তোমার পিতা চলে গেছেন, তাঁরই জন্য কাঁদি, বাবা!"

কৌতূহলী বালক জিজ্ঞাসা করেন,—"তিনি কোথায় গেছেন, মা?"

উপরের দিকে চাহিয়া জননী বলেন,—"ঐ স্বর্গে!"

বালকের মনে কৌতূহল আরও বাড়িয়া উঠে। কোথায় স্বর্গ? কি রকম সে দেশ? কাহারা সেখানে থাকে?

জননী আমিনা যথাসাধ্য শিশুর প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেন।

কিন্তু তিনি যতই উত্তর দেন, পুত্রের কৌতূহল ততই বাড়িয়া উঠে। সেই অজানা অদেখা স্বর্গভূমির জন্য শিশু মোহম্মদ আকাশের দিকে নিয়ত চাহিয়া থাকেন।

তখন হইতেই শিশুর দৃষ্টি মাটির পৃথিবীর উর্ধ্বে ঐ উপরের স্বর্গ-লোকের দিকে নিবদ্ধ হইয়া রহিল। সারা জীবন তিনি সাধনা করিয়া মানুষকে সেই রহস্যময় দেশের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন, বুঝাইয়া গিয়াছেন —কি করিয়া স্বর্গকে পৃথিবীর নিকটে আনা যায়, কি করিয়া পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করা যায়, কি করিয়া মানুষ পায় অক্ষয়-স্বর্গের অধিকার।

জন্মগ্রহণ করিয়া শিশু মোহম্মদ পিতার মুখ দেখিতে পান নাই। ছয়বৎসর যাইতে না যাইতে মাতাকেও হারাইলেন। বিশ্বের প্রভু শিশুকে যেন নিজ তত্ত্বাবধানে লইলেন।

পিতামহ মোতালেব তখনও জীবিত। বুকে পাষাণ বাঁধিয়া তিনি মোহম্মদের লালন-পালনের ভার লইলেন। কিন্তু দুই বৎসর যাইতে না যাইতে মোতালেবও স্বর্গারোহণ করিলেন। মৃত্যুশয্যায় তিনি অনাথ বালককে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত আবুতালেবের হাতে দিয়া গেলেন। এই নিদারুণ সাংসারিক দুর্যোগের মধ্যে শিশু মোহম্মদ এক কোল হইতে অন্য কোলে কেবল যাতায়াত করিতে লাগিলেন।

শিশু যখন দ্বাদশ বৎসর হইল, সেই সময় আবুতালেব বাণিজ্যের জন্য দেশান্তরে যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। বালক মোহম্মদ তাঁহার সঙ্গ ছাড়িলেন না। সেই দ্বাদশ বৎসরের বালককে সঙ্গে লইয়া তিনি দেশান্তর যাত্রা করিলেন। যে শিক্ষা ক্ষুদ্র পাঠশালায় সম্ভব হয় নাই, মোহম্মদ বাল্যকালের বৃহত্তর জগৎ ও জীবনের সংস্পর্শে আসিয়া সেই শিক্ষা লাভ করিলেন।

দেশ হইতে দেশান্তরে ভ্রমণকালে, আপনার অসাধারণ প্রতিভার বলে মোহম্মদ লোকের মুখে মুখে দেশের ইতিহাস সমস্ত জানিতে পারিলেন। কেহ তাঁহাকে কোন পাঠ দেয় নাই, কিন্তু আবুতালেবের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে ব্যবসায়-সংক্রান্ত সমস্ত তথ্যের হিসাব তিনি শিখিয়া ফেলিলেন। অতঃপর সমগ্র সিরিয়া পরিভ্রমণ করিয়া যখন মোহম্মদ ফিরিলেন, তখন

সেই অল্প বয়সেই তাঁহার বুদ্ধি, মেধা এবং লোকচরিত্র-জ্ঞান দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল। তাই মোহম্মদ যখন একাকী বাণিজ্যের জন্য বিদেশে যাইতে চাহিলেন, তখন তাঁহাকে কেহই বাধা দিল না।

একা সেই কিশোর বয়সে নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া যখন স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন, তখন বয়সে তরুণ হইলেও অভিজ্ঞতায় তিনি প্রবীণ হইয়া উঠিয়াছেন। সর্বদাই কি যেন চিন্তায় মগ্ন থাকেন। বাহিরের লোকজন, কোলাহল তাঁহার ভাল লাগে না। তিনি আপনার মনে পিতৃব্যের মেষগুলি লইয়া পার্বত্য প্রদেশের নির্জন মাঠে-মাঠে ঘুরিয়া বেড়ান। কেহ জানিত না, সেই নির্জনতার মধ্যে কি মহাচিন্তা কতখানি তাঁহাকে আবিষ্ট করিয়া রাখে।

এই সময় মক্কানগরে খাদিজা নামে এক ধর্মশীলা ধনী রমণী তাঁহার ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বিষয়-আশয় দেখিবার জন্য একজন উপযুক্ত লোকের সন্ধান করিতেছিলেন। মোহম্মদের চরিত্রগুণের কথা তাঁহার কাণে পৌঁছায়। তিনি মোহম্মদকে সেই কাজে নিযুক্ত করিলেন। মোহম্মদের সাধুতায় এবং বিচক্ষণতায় খাদিজার ঐশ্বর্য দেখিতে দেখিতে দশগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল।

খাদিজা নীরবে দূর হইতে এই যুবককে লক্ষ্য করিতেছিলেন। বাণিজ্যের এই তত্ত্বাবধায়কটিকে জীবনপথের সহযাত্রী করিয়া তুলিবার জন্য তিনি মোহম্মদকে স্বামীত্বে বরণ করিতে চাহিলেন এবং মোহম্মদ সন্তুষ্ট-চিত্তে সেই অশেষ-গুণবতী রমণীর পাণিগ্রহণ করিলেন। খাদিজার সহিত বিবাহের ফলে, তাঁহার অর্থাভাব বিদূরিত হইল; এবং স্বামীর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া খাদিজাও সর্বপ্রকারে স্বামীর জীবনের পরম সহায়িকা হইয়া উঠিলেন।

তখন দ্বন্দ্ব-বিগ্রহে এবং অকারণ রক্তপাতে সমগ্র আরব দেশ ক্ষত-বিক্ষত, সামান্য ব্যাপারেও মানুষ মানুষকে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইত না। মোহম্মদ বুঝিলেন, কুসংস্কার এবং ধর্মহীনতাই ইহার একমাত্র কারণ। সেই কুসংস্কার দূর করিয়া সাম্যবাদ-মূলক এক-ধর্মের মধ্যে ইহাদের মিলিত করিতে হইবে, এবং ইহাদের কেন্দ্র করিয়া এমন এক ধর্ম

প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, যাহাতে সকল মানুষই এক ভগবানের সন্তান, এই বুদ্ধির প্রেরণায় সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত হয়। সেই সংকল্প করিয়া তিনি আপনার মনে ঈশ্বরোপলব্ধির জন্য সাধনায় মগ্ন হইলেন। কঠোর তপস্যার পর তিনি একদা অন্তরে দৈব-সত্যের স্পর্শ পাইলেন, যেন কোন মহাশক্তি তাঁহার মুখ দিয়া সাম্যের সেই মহাসত্যকে উদ্ঘাটন করিতে চায়। সেই দিব্য-জ্ঞানের আলোকে তাঁহার চোখের সম্মুখে জগতের জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার আপনা হইতে খুলিয়া গেল। যে জ্ঞান ও বিদ্যা লোকে আজীবন পাঠ ও অনুশীলনের দ্বারা পায়-না, দিব্যস্পর্শে এক নিমেষের মধ্যে সেই মহাজ্ঞান তাঁহার অন্তরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

খাদিজা সর্বান্তঃকরণে সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিয়া ঈশ্বর-সাধনায় স্বামীকে সাহায্য করিয়া চলিয়াছিলেন। কোনও দিন আত্মসুখের জন্য তিনি স্বামীর সেই কঠোর সাধনায় বিঘ্নস্বরূপ হন নাই। আজ তাই মোহম্মদ যখন সেই দিব্য-সত্যের অধিকারী হইলেন, প্রথম তিনি খাদিজার কাছেই তাঁহার অন্তরের পরম-বাণী প্রকাশ করিলেন। খাদিজার দুই চোখে আনন্দের ধারা গড়াইয়া পড়িল। এই দ্বাদশ বৎসর কাল ধরিয়া তিনি নীরবে যে জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন, আজ তাহা চরম-সিদ্ধির রূপ ধরিয়া তাঁহার স্বামীর জীবনে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

মোহম্মদ স্থির করিলেন, বহু পুরোহিত ও বহু প্রতিমায় আচ্ছন্ন আরববাসীর মনকে এক নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনায় সম্মিলিত করিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে চির-প্রচলিত উচ্ছৃংখল জীবনযাত্রার প্রণালী দূর করিয়া সুনিয়মিত সুসংযত, এমন এক অভিনব জীবন-যাত্রার প্রণালীর প্রবর্তন করিতে হইবে, যাহাতে মানুষ আত্মকল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের কল্যাণকেও খুঁজিয়া পায়। ইহাই হইল ইসলাম ধর্মের বীজমন্ত্র।

সর্ববিধ সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়া মোহম্মদ সেই নূতন ধর্মের প্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করিলেন। মাত্র চারিজন লোক তাঁহার প্রথম শিষ্য হইলেন—খাদিজা, আবুতালেবের পুত্র কিশোর আলি, তাঁহার প্রিয় ভৃত্য সৈয়দ ও আবুবকর। এই চারিজন শিষ্যকে লইয়া তিনি ধর্মের দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিলেন।

বহুধা বিক্ষিপ্ত মানুষের চিত্তকে বিপথ হইতে টানিয়া আনিয়া তিনি

আহ্বান করিলেন,—"বহু নেই, আছেন শুধু এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর, তিনি তোমাদের আহ্বান করেছেন, শোন।"

মোহম্মদের সেই আহ্বান জড়তায় মুহ্যমান আরববাসীর কাণে তীব্র বিদ্রোহের বাণীর মত শোনাইল। তাহারা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহারা যতই ক্ষিপ্ত হয়, মোহম্মদের বাণী ততই দীপ্ত হইয়া উঠে।

অতঃপর মোহম্মদকে নিরস্ত করিবার জন্য নানাপ্রকারের চেষ্টা হইল, কিছুতেই কিছু হইল না। এক, দুই, তিন করিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহার শিষ্যের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। কোরেশদের গৃহে ক্রমে মোহম্মদকে লইয়া দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। মোহম্মদের শত্রুপক্ষ তাহাকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। আবু জেহাল নামে এক ব্যক্তি এই কাজের ভার লইল।

তখন মোহম্মদ গৃহ-বিতাড়িত হইয়া তাঁহার প্রিয় শিষ্য আরকমের বাড়ীতে অবস্থান করিয়া ইসলামের বাণী প্রচার করিতেছিলেন। সহসা সেখানে উপস্থিত হইয়া আবু জেহাল মোহম্মদকে অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া প্রহারে প্রহারে জর্জরিত করিল। সেই ঘটনার কথা শুনিয়া মোহম্মদের এক পিতৃব্য আবু জেহালকে প্রহারে ভূতলশায়ী করিলেন। ইহার পর ওমর নামে আর একজন যুবক তরবারি-হাতে ছুটিল মোহম্মদকে বধ করিতে! পথে শুনিল, তাহার নিজের ভগিনী ফাতেমা এবং তাহার স্বামী মোহম্মদের ধর্মগ্রহণ করিয়াছেন। ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া সে নিজের ভগিনীকে শাস্তি দিবার জন্য ছুটিল।

ভগিনীর গৃহে উপস্থিত হইয়া ফাতেমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন ওমর স্পষ্ট উত্তর পাইল যে, তাঁহারা দুইজনে স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তখন সে নিজের ভগিনীপতিকে আক্রমণ করিল। ফাতেমা বাধা দিতে গিয়া সাংঘাতিক ভাবে আহত হইলেন। ভুলুণ্ঠিত অবস্থায় তাঁহাদের দুইজনের গা দিয়া অজস্র ধারায় রক্ত পড়িতেছে। তাঁহাদের সেই অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া ওমর মুক্ত তরবারি হস্তে প্রস্থানে উদ্যত হইল দেখিয়া একান্ত বিনীতভাবে ফাতেমা বলিয়া উঠিলেন,—"দাদা, তুমি বড় ক্লান্ত—বোনের বাড়ী এসে শুধু মুখে চলে যাবে?"

সহসা মমতাময়ী নারীর কণ্ঠে সেই মধুর স্নেহের আপ্যায়ন শুনিয়া নির্দয় ওমর স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে ফিরিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, নিজেদের আঘাতের কথা ভুলিয়া ফাতেমা তাহার জন্য খাদ্য ও পানীয় লইয়া আসিলেন। তাঁহার স্বামী সেই আহত অবস্থায় উঠিয়া ব্যজনী লইয়া তাহাকে বাতাস করিতে করিতে বসিলেন। এইমাত্র তাঁহাদের প্রতি নিমর্ম-ভাবে যে আঘাত করিয়াছে, এখনও সেই আঘাতের ফলে যে অবিরল-ধারায় রক্ত প্রবাহিত হইতেছে, সেইদিকে তাহাদের বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নাই। এই অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়া ওমরের হাত হইতে তরবারি আপনা হইতে খসিয়া পড়িল। এক নিমেষের মধ্যে সে হজরৎ মোহম্মদের মস্তক ছেদন করার প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গেল। যে মহাপুরুষের সংস্পর্শে এই দুইটি সামান্য নরনারী এই অসাধারণ শক্তির অধিকারী হইয়াছে, সে মানব না জানি কি শক্তিধর!

অতঃপর ওমর ভগিনীপতিকে সঙ্গে করিয়া মোহম্মদের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং উম্মুক্ত তরবারি মোহম্মদের পায়ের কাছে রাখিয়া দিয়া তাঁহার অনুচর হইলেন।

এইভাবে নিজের চরিত্রগুণে মোহম্মদ একে একে তাঁহার পাশে যাঁহাদের আকর্ষণ করিয়া আনিলেন, তাঁহারা এক নিমেষের মধ্যে অলৌকিক শক্তির অধিকারী হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু মোহম্মদের শত্রুপক্ষও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া ছিল না। তাহারা যখন দেখিল যে, তাহাদের সমস্ত খন্ড খন্ড চেষ্টা ব্যর্থ হইল, তখন তাহারা সকলে একত্র হইয়া সমর-সজ্জায় সজ্জিত হইল এবং সদলবলে মোহম্মদকে বধ করিবার জন্য রওয়ানা হইল।

মোহম্মদ লোক-মারফৎ এই সংবাদ আগেই জানিতে পারিয়াছিলেন। তাই এখানে মুষ্টিমেয় লোকদের লইয়া তাহাদের বাধা দিবার চেষ্টা না করিয়া তিনি ভক্ত শিষ্যদের সঙ্গে লইয়া রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে ৬২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন মক্কানগরী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এই দিনটি জগতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে এবং এইদিন হইতে ইসলাম-ধর্মাবলম্বিগণ নূতন সাল গণনা করিয়া আসিতেছেন।

মক্কা পরিত্যাগ করিয়া মোহম্মদ মদিনায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইতিমধ্যে মদিনা শহরে বহু লোক তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল। তাহারা তাহাদের মধ্যে মোহম্মদকে পাইয়া আরও উৎফুল্ল হইল। কিন্তু মক্কাবাসী কোরেশগণ যখন শুনিল যে, মোহম্মদ মদিনায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাহারা দলবদ্ধ করিয়া যুদ্ধের জন্য মদিনার দিকে অগ্রসর হইল।

মদিনার নিকট বদরের প্রান্তরে দুই দলে দেখা হইল, এক দিকে দুর্দান্ত কোরেশগণ, সংখ্যায় মদিনাবাসীর অপেক্ষা ঢের বেশী, অপরদিকে ধর্মের জন্য প্রাণ দিতে উদ্যত মুষ্টিমেয় মদিনাবাসী। কিন্তু সেদিন পশুবলের বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে সেই মুষ্টিমেয় লোকদের ধর্মবলের জয় হইল।

মক্কাবাসীরা পরাজিত হইয়া গেল, কিন্তু সেই পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য আবার সমর-আয়োজন করিল, বেদুইন দস্যুরা লুণ্ঠনের আশায় মক্কাবাসীদের সঙ্গে যোগদান করিল।

এই বিরাট বাহিনীর বিরুদ্ধেও মোহম্মদ পশ্চাৎপদ হইলেন না। ঈশ্বরের নাম লইয়া তিনি মদিনাবাসীদের রণে আহ্বান করিলেন। মদিনা শহরের চারিদিকে রাত্রিদিন পরিশ্রম করিয়া এক বিরাট পরিখা খনন করা হইল। সাধারণ সৈনিকের মত মোহম্মদ নিজে কোদাল হাতে সকলের সঙ্গে সেই পরিখা-খননে যোগদান করিলেন। অতঃপর মক্কাবাসীরা মদিনার নিকটবর্তী হইয়া দেখিল, মদিনা শহরে প্রবেশ করিবার পথ রুদ্ধ। সাহস করিয়া এক এক দল যেই পরিখা পার হইতে যায়, অমনি মদিনা-বাসীদের আক্রমণে তাহারা ধরাশায়ী হয়; এইভাবে দিনের পর দিন মদিনায় প্রবেশ করিবার চেষ্টায় তাহারা ব্যর্থকাম হইতে লাগিল।

বেদুইনরা লুটের আশায় আসিয়াছিল, দিনের পর দিন প্রতীক্ষা করিয়া তাহারা ক্রমশঃ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল এবং শেষকালে মক্কাবাসীদের শিবিরেই লুণ্ঠন চালাইতে লাগিল। মক্কাবাসীদের খাদ্য-সামগ্রীও ফুরাইয়া আসিতে লাগিল। যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা বেদুইনরা লুট করিয়া লইতে আরম্ভ করিল। ক্রমশঃ সেই সৈনিকদের মধ্যে অরাজকতা দেখা দিল। কোন কোন দল বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া গেল। এমন সময়

একদিন রাত্রিকালে প্রবল ঝড় উঠিল। ঝড়ের সঙ্গে মরু-বালুকা মিশিয়া এক মহাবিভীষিকা সৃষ্টি করিল। সহসা নিদ্রাভঙ্গে তাহারা দেখিল যে, মোহম্মদ তাঁহার সৈন্যবাহিনী লইয়া তাহাদের আক্রমণ করিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে তাহাদের দলের সমস্ত সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল, প্রবল ঝড়ে তাহাদের শিবির উড়িয়া গেল। প্রাণভয়ে যে যেদিকে পারিল, পলায়ন করিল।

অতঃপর ছয় বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। মোহম্মদের সঙ্গে মক্কা হইতে যে-সব অনুচর আসিয়াছিল, তাহারা স্বদেশ দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সম্মুখে পবিত্র রমজান মাস। মোহম্মদও মক্কাতীর্থে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। পুণ্যমাসে যুদ্ধবিগ্রহ নিষিদ্ধ। তাই সমস্ত যুদ্ধাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ তীর্থযাত্রীর বেশে কয়েকজন মুসলমান সঙ্গে লইয়া মোহম্মদ মক্কাতীর্থে যাত্রা করিলেন। কিন্তু কোরেশ-গণ সুযোগ বুঝিয়া তাঁহাদের শিবির বেষ্টন করিয়া ফেলিল এবং নানাভাবে তাঁহাদিগকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিতে লাগিল। কিন্তু মক্কা দর্শন না করিয়া মোহম্মদ ফিরিতে চাহিলেন না।

তখন কোরেশগণ সন্ধির প্রস্তাব করিল এই শর্তে যে, সেইদিন হইতে দশ বৎসর পর্যন্ত কোরেশগণ মুসলমানদের সহিত কোন যুদ্ধ করিবে না, কিন্তু তাহার পরিবর্তে যে সমস্ত নাবালক আরবসন্তান অভিভাবকদের অনুমতি না লইয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, কোরেশদের হাতে তাহাদের সমর্পণ করিতে হইবে। আপাততঃ লোকক্ষয়-নিবারণের জন্য মোহম্মদ সেই সন্ধিতে সম্মত হন এবং অক্ষরে অক্ষরে সেই সন্ধির শর্ত পালন করিতে থাকেন। এইভাবে কৌশলে তিনি দশ বৎসর কাল সময় পাইলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি অন্যসব দেশে মুসলিম ধর্ম প্রবর্তনের সাধনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। কিন্তু দুই বৎসর যাইতে না যাইতে কোরেশগণ সন্ধির শর্ত ভাঙ্গিয়া মক্কাবাসী মুসলমানদের নির্যাতন করিতে লাগিল। এই দুই বৎসরের মধ্যে মোহম্মদ নীরবে এক বিপুল মুসলমান বাহিনী গড়িয়া তুলিতেছিলেন। তিনি যখন দেখিলেন যে, কোরেশগণ সন্ধির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে, তখন তিনি মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন।

কোরেশগণের নেতা আবু সোফিয়ান বন্দী হইল। বন্দী অবস্থায় তাহাকে মোহম্মদের নিকট আনা হইল। মোহম্মদ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আবু সোফিয়ান, তুমি এখন আমার বন্দী। নিরীহ মুসলমানদের ওপর তুমি যে নির্যাতন করেছ, তা স্মরণ করে বল, তুমি আমার কাছ থেকে কিরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর?"

হৃতবল আবু সোফিয়ান কাতরভাবে প্রাণভিক্ষা চাহিল। মোহম্মদ তৎক্ষণাৎ তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন, বলিলেন,—"আমি কারো প্রাণনাশ করতে আসি নি—আমি এসেছি তোমাদের ভুল তোমাদের বুঝিয়ে দিতে। যদি তোমরা তোমাদের ভুল বুঝতে পেরে থাক, সেই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

আবু সোফিয়ান মুগ্ধ বিস্ময়ে গৃহে ফিরিয়া গেল। তাহার অন্তরে সেই ক্ষমাসুন্দর ব্যবহার এক মহা বিপর্যয় ঘটাইয়া দিল।

অতঃপর মোহম্মদ মক্কার দিকে রওয়ানা হইলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন, মক্কাবাসীরা আক্রমণ না করিলে, তাঁহারা কেহই অস্ত্র স্পর্শ করিবেন না। কিন্তু ইতিমধ্যে কয়েকদল মক্কাবাসী সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া গোপনে তীর ছুঁড়িতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের সেই আক্রমণ অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিহত হইয়া গেল।

মক্কাবাসীরা ঘরে ঘরে এবার প্রমাদ গণিতে লাগিল। বিজয়ী মুসলমান-বাহিনী এতদিন পরে তাহাদের সমস্ত নির্যাতনের প্রতিশোধ লইবে। সেই ভয়াবহ প্রতিশোধের কাল্পনিক চিত্রে তাহারা ভয়ে ঘর ছাড়িয়া পালাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু কিছুকাল পরে তাহারা সবিস্ময়ে দেখিল যে, বিজয়ী সৈন্যকে পিছনে রাখিয়া শূন্য হস্তে ফকিরের বেশে মোহম্মদ মক্কাধামে প্রবেশ করিতেছেন, তাঁহার হাতে তরবারি নাই, তাঁহার আশে-পাশে সশস্ত্র রক্ষীও নাই। মোহম্মদের সেই ক্ষমা-সুন্দর অপূর্ব বিজয়ী মূর্তি দেখিয়া কোরেশগণের বর্বর-চিত্ত মুগ্ধ হইয়া গেল। মোহম্মদের সাধনা এতদিনে সফল হইল। অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত ও ছত্রভঙ্গ মরু-আরব তাঁহার পতাকা-তলে সমবেত হইয়া একজাতিতে পরিণত হইল।

দেখিতে দেখিতে মোহম্মদের প্রভাব মরু-আরব ছাড়াইয়া আশে-পাশের

রাজ্যে সঞ্চারিত হইল। তাঁহার পাশে তখন একদল নূতন বীর মানবের সৃষ্টি হইয়াছে ; ওমর, আব্বাস, আবুবকর, আবদুর রহমান—যেন মরু-আরবের তেজের জীবন্ত বিগ্রহ! এই মহীয়ান অনুচরবর্গের সাহায্যে সেদিন ইসলামের দিগ্‌বিজয়ের সূচনা হইল—জগতের সভ্যতায় এক নূতন ভাবধারা দেখা দিল।

দৈবশক্তির কৃপায় মোহম্মদের অন্তরে যে দিব্য-জ্ঞানের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, অনাগত মানবদের জন্য তিনি যাহা প্রচার করিয়া গেলেন, তাহাই পরে "কোরাণ" নামে উপনিবদ্ধ।

মোহম্মদ আরববাসীকে কেবল নূতন ধর্ম দেন নাই—তিনি দুর্দান্ত মরুবাসীদের এক সূত্রে বাঁধিয়া বীর জাতিতে পরিণত করিয়া গেলেন। তারপর একদা ৬৩১ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুন মধ্যাহ্নকালে তাঁহার জয়-পতাকা ভক্ত-অনুচরদের হাতে তুলিয়া দিয়া তিনি মহাপ্রয়াণ করিলেন। তাঁহার তিরোধানের পর তাঁহার সুযোগ্য অনুচরদের বীর পদাঘাতে আরবের মরুভূমির তপ্ত বালুকণা জগতের দেশ-দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িল।

সার্থক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ মাত্র উনচল্লিশ বৎসরকাল এই পৃথিবীতে আয়ু লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে জগতের ধর্ম-জীবনের এতই কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন যে দেশে-বিদেশে আজিও তাঁহার জীবনের ব্রতকাহিনীর বর্ণনা ফুরাইতেছে না। আমাদের দেশে তাহার কথা লইয়া প্রতিদিনই মঠে-মঠে, সভা-সমিতিতে, সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে, সংবাদপত্রে কোথাও না কোথাও আলোচনা চলিতেছে। তাঁহার নাম করিলে এ দেশের লোক তো বটেই—বিদেশেরও বহু লোক তাঁহার উদ্দেশ্যে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া থাকেন। এমন বাড়ী নাই, যে বাড়ীতে তাঁহার ছবি নাই। ইংরেজী ও বাংলাতে তাঁহার জীবনচরিত যে কত প্রকাশিত হইয়াছে এবং কত কবি যে তাঁহার উদ্দেশ্যে কত কাব্যকবিতা লিখিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই! ফরাসী দেশের মহা পণ্ডিত রোমাঁ রোল্যাঁ সাহেব পরম ভক্তিভরে ফরাসীভাষায় তাঁহার জীবন-কথা লিখিয়াছেন।

কলিকাতা নগরে সিমুলিয়ার দত্ত পরিবারে ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দের ৯-ই জানুয়ারী তারিখে এই মহাপুরুষের জন্ম হয়। তাঁহার শৈশবের নাম বীরেশ্বর। ছাত্রজীবনের নাম নরেন্দ্রনাথ। ছাত্রজীবনেই তিনি অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নরেন্দ্রনাথ আইন পড়িবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু মানবজাতির

কল্যাণের জন্য যাঁহার জীবন উৎসর্গ করিবার কথা, তাঁহার জীবন আদালতের ঘরে তো নষ্ট হইতে পারে না!

বিলাতী শিক্ষার ফলে নরেন্দ্রনাথের মনে প্রথম যৌবনে নাস্তিকতার ভাব জন্মিল। এই সময়ে তিনি ব্রাহ্মসমাজে নিয়মিত যাতায়াত করিতেন। ব্রাহ্মদের সংসর্গে তাঁহার সেই নাস্তিকতার ভাব দূর হইল। কিন্তু হিন্দু ধর্মের প্রতি তখনও শ্রদ্ধা ছিল না। সেই সময় একদিন তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর পরমহংসদেবের নিকট গমন করেন। প্রথম সাক্ষাতেই পরস্পরের প্রতি পরস্পরের গভীর অনুরাগ জন্মিল। নরেন্দ্রনাথ পরমহংসদেবের পরম ভাবে ও অপরূপ ভাষায় মুগ্ধ হইয়া দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। পরমহংসদেবের উপদেশ ও অনুগ্রহে নরেন্দ্রনাথের সাধক-জীবনের সূত্রপাত হইল। নরেন্দ্রনাথ সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন। তখন তাঁহার নাম হইল স্বামী বিবেকানন্দ।

তারপর ছয় বৎসরকাল স্বামীজির আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি এই কয় বৎসর হিমালয় প্রদেশে কোন অজ্ঞাত স্থানে কঠোর যোগসাধনা করিয়াছিলেন এবং তিব্বত গমন করিয়াছিলেন। তারপর সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিয়া তিনি বহু আশ্রম-মঠে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং পরমহংসদেবের বাণী প্রচার ও আপনার নিজস্ব ধর্মমত গঠন করেন।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার শিকাগো নগরে পৃথিবীর সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণের একটি সভা হয়। তাহাতে বিবেকানন্দ হিন্দু সমাজের পক্ষ হইতে ভারতের প্রতিনিধি হইয়া গমন করেন। সেই সভায় পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিগণের সম্মুখে স্বামীজি হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন তাহাতে সকলেই স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইয়া যান। স্বামীজির সেই বক্তৃতা শুনিয়া সমগ্র জগৎ জানিতে পারে যে, প্রকৃত হিন্দু-ধর্ম কি এবং ভারতবাসীরা কতদূর উন্নত সংস্কৃতিসম্পন্ন ও ধর্মে মহান। স্বামীজী সমগ্র জগতের চোখে ভারতের প্রকৃত মহিমাকে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া আমাদের জাতীয় গৌরব বাড়াইয়া দিলেন, জগৎ সভায় হিন্দুধর্ম ও হিন্দু ঐতিহ্যের সম্মানের আসন করিয়া দিলেন।

ইহার পর আমেরিকার বহু লোক দলে দলে তাঁহার শিষ্য হইলেন। স্বামীজি আমেরিকার নানাস্থানে বক্তৃতা করিয়া ধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে গিয়া ধর্ম প্রচার করেন। সেখানে যাঁহারা তাঁহার ধর্মে দীক্ষিত হন তাঁহাদের মধ্যে সিস্টার নিবেদিতার নাম এদেশের সকলেই জানেন। ইংলণ্ডে ধর্ম প্রচারের পর তিনি ভারতে ফিরিয়া আসিয়া কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন।

আমাদের বিশ্বাস ছিল, যাঁহারা সন্ন্যাসী বা বৈরাগী হইবেন—তাঁহাদিগকে কেবল জপতপ লইয়াই থাকিতে হইবে; তাঁহাদের নিজেদের সাংসারিক প্রয়োজন বা অভাব নাই, অতএব তাঁহাদিগকে কোন কাজ করিতে হয় না। দেশভরা রোগ, শোক, জাতির নানা সংকট, অন্নকষ্ট ইত্যাদি যত দুঃখই থাকুক, তাহাতে তাঁহাদের কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই; তাঁহাদের ভাবিবার কথা সে সব লইয়া নয়। স্বামীজিই প্রথম এদেশে প্রচার করিলেন যে নিষ্কর্মা সন্ন্যাসী দেশের গলগ্রহ। সন্ন্যাসীর নিজের ঘর সংসার নাই, অতএব সমস্ত দেশই তাঁহার ঘরসংসার বলিয়া বুঝিতে হইবে; নিজের আত্মীয়জন কেহ নাই তাই সমগ্র দেশবাসীই তাঁহার আত্মীয়বন্ধু।

বিবেকানন্দ বলিলেন—"এদেশের লোক বড় দুঃখী, জগতে এত দুঃখী কোথাও নেই। এদেশের সন্ন্যাসীর প্রধান ব্রত বা প্রধান ধর্ম হওয়া উচিত একমাত্র দুঃস্থ দরিদ্রগণের সেবা। দরিদ্র লোকদের মনে করতে হবে "দরিদ্র নারায়ণ।"

দরিদ্র নারায়ণের সেবার জন্য তিনি নানা স্থানে মঠ ও আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং বেলুড় মঠে শিষ্যসন্ন্যাসীদিগকে সেবা-ধর্মে দীক্ষা দান করিতে লাগিলেন। সেখান হইতে দলে দলে সন্ন্যাসীরা সমস্ত ভারতবর্ষে আর্ত, বিপন্ন পীড়িতগণের সেবার জন্য তীর্থযাত্রা করিতে লাগিলেন।

অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়াও তিনি দেশের মঙ্গলের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন এবং আর একবার আমেরিকা ও ইওরোপ যাত্রা করিয়া তাঁহার নব ধর্মমত প্রচার করিয়া আসিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি দেশে ফিরিয়া আসিতে সক্ষম হন এবং ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে বেলুড় মঠে দেহত্যাগ করেন।

এই মহাপুরুষ কেবল হিন্দুধর্ম প্রচার করেন নাই—নূতন একটি ধর্মই দিয়া গিয়াছেন। এই ধর্মের নাম 'সেবা-ধর্ম'। তিনি কেবল সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন নাই, অনেক মানুষের মত মানুষ গড়িয়া গিয়াছেন। তিনি মুখে কেবল ধর্মোপদেশ দেন নাই—ইংরাজী ও বাঙ্গলায় বহু গ্রন্থও লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনই তাঁহার বাণী।

"শুনি এ ভারত হয়েছে স্বাধীন
এসেছে তোমারে স্মরিবার দিন
তোমার বাণীতে হলে উদাসীন
চির দাসত্বে রবে সে পড়ি।"

লোকজননী রাণী ভবানী

পুঁটিয়ার রাজা দর্পনারায়ণের উকীলরূপে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ রঘুনন্দন মুর্শিদাবাদ নবাব-সরকারে কাজ করিতেন। নিজের বুদ্ধিবলে তিনি নায়েব-কানুনগোর পদ প্রাপ্ত হন। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর অনুগ্রহে তিনি প্রচুর টাকাকড়ি রোজগার করিয়া নিজের ভাই রামজীবনের নামে প্রকাণ্ড জমিদারি ক্রয় করেন। এই রামজীবনের পুত্র ছিলেন রামকান্ত। তিনি সমস্ত জমিদারির ওয়ারিশ হন—কিন্তু জমিদারি রক্ষার যোগ্যতা তাঁহার মোটেই ছিল না। তাঁহার গুণবতী পত্নীর বুদ্ধিবলেই তাঁহার জমিদারী বাঁচিয়া যায়। সেই গুণবতী পত্নীই নাটোরের রাণী ভবানী।

ভবানী রাজসাহী জেলার ছাতিনা গ্রামের আত্মারাম চৌধুরীর কন্যা। আত্মারাম চৌধুরী ছিলেন মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর গৃহস্থ। কন্যাটি অপূর্ব লাবণ্যবতী ও সুলক্ষণা ছিল বলিয়া দেওয়ান দয়ারাম রায় তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করেন এবং রামকান্তের সহিত বিবাহ দেন।

বাকী খাজনার দায়ে জমিদারি অন্য হাতে চলিয়া গেলে রাণী ভবানী ও দেওয়ান দয়ারামের চেষ্টায় রামকান্ত তাহা ফিরিয়া পাইলেন। রামকান্ত কিন্তু বেশীদিন জমিদারী ভোগ করিতে পারিলেন না,—অল্প বয়সেই মারা গেলেন। রাণী ভবানীর দুইটি পুত্র ছিল, তাহারাও অল্পবয়সে মারা যায়। তারাসুন্দরী নামে তাঁহার একটি কন্যা ছিল। তিনিও অল্পবয়সেই বিধবা হন। রাণী ভবানীর দত্তকপুত্র রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী হইয়া গেলেন এবং রাণীর জীবদ্দশাতেই মারা গেলেন।

সকলকে হারাইয়া রাণী ভবানীর সংসার হইল সমগ্র বাংলাদেশ—বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গ। দীন-দুঃখীদের সেবায় তিনি তাঁহার অগাধ ধন ও উদার মন নিয়োগ করিলেন।

অন্নদান, বস্ত্রদান, জলদান, ঔষধদান, ভূমিদান ইত্যাদি যত প্রকারের দান সম্ভব হইতে পারে, তিনি কোনোটাই বাদ দেন নাই। নবাব সরকারের খাজনা দিয়া এবং জমিদারি রক্ষার ব্যয় বাদ দিয়া তাঁহার যাহা কিছু আয় সবই তিনি সৎকর্মে উৎসর্গ করিতেন। রাণী ভবানী ছিলেন ব্রহ্মচারিণী হিন্দু বিধবা, কাজেই নিজের জন্য ব্যয় তাঁহার বিশেষ কিছু ছিল না। তাঁহার দান ছিল প্রধানতঃ পুণ্যকর্মে ও ধর্মকার্যে। দেশের ব্রাহ্মণগণই তাঁহার দান সবচেয়ে বেশি পাইয়াছিলেন। যাঁহাদের টোল, দেবালয় অথবা মঠ ছিল, তাঁহারা তো নিষ্কর ভূমি পাইয়া ছিলেনই,—উত্তরবঙ্গে এমন ব্রাহ্মণ ছিল না, যিনি রাণীর দেওয়া ব্রহ্মোত্তর ভূমি লাভ করেন নাই। বারো মাসে তেরো পার্বণে ও ব্রত-পুণ্যাহে তিনি ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রের ভোজনাদিতে বহু অর্থ ব্যয় করিতেন।

রাণী ভবানী ভিন্ন ভিন্ন তীর্থেও অনেক সদানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেগুলির মধ্যে কাশীধামে তাঁহার কীর্তিগুলি আজিও তাঁহার মহিমা কীর্তন করিতেছে। কাশীর ভবানীশ্বর শিব তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। দুর্গাবাড়ী, দুর্গাকুণ্ড, পঞ্চক্রোশী পথ, আদি কেশবের ঘাট ইত্যাদি তাঁহার অর্থেই নির্মিত। মুর্শিদাবাদ বড়নগরে ছিল তাঁহার গঙ্গাবাসের বাড়ী। এখানেও তাঁহার অনেক পুণ্যকীর্তি ছিল। বহুস্থলেই তিনি দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং দেবসেবার জন্য ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। ইহা ছাড়া জলকষ্ট নিবারণের জন্য তিনি দেশের বহুস্থলে পুষ্করিণী খনন করাইয়া গিয়াছেন।

তাঁহার জমিদারির আয় ছিল দেড়কোটি টাকার উপর, ৭০ লক্ষ টাকা নবাবকে খাজনা দিতে হইত। বাকি টাকার অধিকাংশই পুণ্যকর্মে ব্যয়িত হইত। কথিত আছে, ভূমিদান ছাড়া ৫০ কোটি টাকা তিনি দান করিয়া গিয়াছেন।

রাণী ভবানী ইন্দোরের মহারাণী অহল্যাবাঈ-এর মতই তেজস্বিনী ও বুদ্ধিমতী মহিলা ছিলেন। তিনিও বিষয়কর্ম নিজেই দেখিতেন। এ বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ বিচক্ষণতা ছিল। সেকালের অন্যান্য জমিদাররা সামাজিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে রাণী ভবানীর পরামর্শ গ্রহণ করিতেন এবং তাঁহার আদর্শেই আপন-আপন জমিদারিতে সদানুষ্ঠান করিতেন। লোক-হিতসাধনে অনেকেই রাণীর কাছে দীক্ষালাভ করেন।

হাতে লয়ে হেমঝারি
তৃষিত কণ্ঠে করুণা ঢালিতে তুমি এসেছিলে নারী।

বীরসিংহের সিংহ-শিশু

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বাঙলাদেশে একটি অবিস্মরণীয় নাম। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, করুণায়, সেবায়, চরিত্রবলে যে সব বাঙালী ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতার নাম ভগবতী দেবী। ঠাকুরদাস অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। তিনি কলিকাতায় একটি সামান্য চাকুরি করিতেন।

ছেলেবেলায় ঈশ্বরচন্দ্র অত্যন্ত দুরন্ত ও অবাধ্য ছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন খুবই বুদ্ধিমান ও মেধাবী। অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার গ্রামের পড়া শেষ হইল। তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে উচ্চ ইংরেজী শিক্ষার জন্য কলিকাতায় লইয়া গেলেন। কলিকাতাতে আসিয়া তিনি পিতার মনিব বড়বাজারের ভাগবতচরণ সিংহের ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তখন পায়ে হাঁটিয়া কলিকাতা আসিতে হইত। পথে বালক ঈশ্বরচন্দ্র মাইলস্টোনগুলিতে ইংরেজী মাইলের সংখ্যা পড়িয়া সংখ্যার সব অক্ষর শিখিয়া ফেলিলেন।

নয় বৎসর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ঈশ্বরচন্দ্রকে বিশেষ কষ্ট করিয়া লেখাপড়া শিখিতে হইয়াছিল। কলিকাতার বাসায় তাঁহাকে হাট-বাজার, রান্না, বাসন-কোসন ধোয়া সবই করিতে হইত। ইহারই ফাঁকে ফাঁকে তিনি লেখাপড়া করিতেন এবং সর্বদা প্রথম স্থান

অধিকার করিয়া বৃত্তি ও পুরস্কার পাইতেন। এই সময়ে ভাগবতচরণ সিংহের কনিষ্ঠ কন্যা রাইমণি তাঁহার মা-এর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের কোমল হৃদয় কোনও দিন রাইমণির সেই স্নেহযত্নের কথা বিস্মৃত হয় নাই। বৃদ্ধ বয়সেও রাইমণির কথা বলিতে বলিতে কৃতজ্ঞতায় তাঁহার চক্ষু হইতে দরদর করিয়া জল পড়িত। একুশ বৎসর বয়সেই ঈশ্বরচন্দ্র ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, ন্যায়, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। কলেজ হইতে বাহির হইবার সময়ে তাঁহাকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি দেওয়া হয়। পরে তিনি ইংরেজী এবং হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

একুশ বৎসর বয়সেই তাঁহার কর্মজীবন শুরু হয়। পঞ্চাশ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা ভাষার প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি বাংলা ভাষায় 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' পুস্তক রচনা করিয়া সবিশেষ প্রশংসা লাভ করেন। অতঃপর তিনি কিছুদিন সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদকের পদ লাভ করিলেন। কিন্তু উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ রসময় দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে মতভেদ হওয়াতে অল্পদিনের মধ্যে তাঁহাকে ঐ পদ পরিত্যাগ করিতে হইল।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কেরানী দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্মত্যাগ করিয়া চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করায় অধ্যক্ষ মার্শাল সাহেবের অনুরোধে বিদ্যাসাগর মাত্র মাসিক ৮০ টাকা বেতনে ঐ কর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু সে পদেও তাঁহাকে বেশিদিন থাকিতে হয় নাই। ওই সময়ে তাঁহার বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার কর্মত্যাগ করায় সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যাধ্যাপকের পদটি শূন্য হইল। মহাত্মা বেথুনের পরামর্শে বিদ্যাসাগর ঐ পদ গ্রহণ করিলেন। সেই পদ হইতেই পরিণত জীবনে তিনি, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে উন্নীত হন। সেই সঙ্গে তিনি সরকারের শিক্ষাবিভাগের অধীনে বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাজও করিতেন। দেশের নারীসমাজের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার না হইলে জাতির উন্নতি সম্ভব নয়, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য নানাভাবে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি

সরকারের সাহায্যে দেশে সর্বত্র বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সরকারের শিক্ষা-বিভাগের নবনিযুক্ত ডিরেক্টর গর্ডন ইয়ং-এর সহিত দেশের সাধারণ জনগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে তাঁহার ঘোরতর বিবাদ ঘটায় তিনি সরকারী পদ হইতে পদত্যাগ করেন এবং নিজচেষ্টায় শিক্ষা-বিস্তারের কাজে ও সমাজসেবায় সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন।

সরকারী চাকুরী ছাড়িয়া দিলেও তাঁহাকে অবশ্য আর্থিক দুরবস্থায় পড়িতে হয় নাই। তিনি নিজে পুস্তক রচনা করিতেন এবং নিজের প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানায় ছাপাইয়া সেগুলি সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিতেন। ছাপাখানা ও পুস্তক বিক্রয় হইতে তাঁহার প্রচুর আয় হইত। 'বর্ণপরিচয়', 'কথামালা', 'বোধোদয়', 'আখ্যানমঞ্জরী' প্রভৃতি নানা পাঠ্য-পুস্তক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তিনি লিখিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় সহজ ব্যাকরণ 'উপক্রমণিকা' এবং 'ব্যাকরণ কৌমুদী' রচনা করিয়া তিনি ছাত্রদের সংস্কৃত শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দেন। 'সীতার বনবাস' ও 'শকুন্তলা' লিখিয়া বাংলা গদ্যে বিপ্লব আনয়ন করেন।

সরকারের মুখাপেক্ষী না থাকিয়া নিজের একক প্রচেষ্টায় তিনি দেশের সর্বত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন। এগুলির মধ্যে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই শিক্ষালয়ের কলেজ বিভাগটি এখন 'বিদ্যাসাগর কলেজ' নামে পরিচিত। তিনি নিজ গ্রামে মাতার নামে 'ভগবতী বালিকা বিদ্যালয়' স্থাপন করেন।

বিদ্যাসাগরের অমর কীর্তি বিধবাবিবাহ প্রবর্তন। এই বিপ্লবাত্মক প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে গোঁড়া হিন্দুরা প্রবল আন্দোলন করেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর তাহাতে ভীত হইলেন না। তিনি হিন্দুশাস্ত্র হইতে বিবিধ প্রমাণ উপস্থাপনা করিয়া দেখান যে, হিন্দুশাস্ত্রে বিধবা-বিবাহের বিধান আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অন্যতম বন্ধু শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন এক বিধবার পাণিগ্রহণ করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্রীয় বিচারে সন্তুষ্ট না থাকিয়া যখন কার্যতঃ বিধবা-বিবাহ প্রচলনে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন দেশের সাধারণ গোঁড়াহিন্দুরা একেবারে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল। সেই সময়ে শান্তিপুরের তাঁতীরা 'বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবি হয়ে' এই গানাঙ্কিত

কাপড় পর্যন্ত বাহির করিয়াছিল। এমনকি এ সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবার প্রাণসংশয় ঘটিয়াছিল।

বিদ্যাসাগর যে প্রবল আন্দোলন শুরু করেন, তাহার ফলে সরকার বিধবাবিবাহ শেষপর্যন্ত আইনসিদ্ধ করিয়া দিলেন।

বিদ্যাসাগর কেবলই বিদ্যারই সাগর ছিলেন না, তিনি ছিলেন করুণার সাগর। মহাকবি মাইকেল মধুসূদন তাঁহাকে 'দীনের বন্ধু' বলিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর কেবল দীনেরই বন্ধু ছিলেন না; ধনী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র, নিঃস্ব সকলেরই বন্ধু ছিলেন। তিনি অকৃপণ হস্তে অভাবগ্রস্তকে অর্থ সাহায্য করিতেন, বিপন্নকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেন। তাঁহার দানের কথা কিংবদন্তীতে পরিণত হইয়াছিল। কত দুঃস্থ পরিবার ও দুঃখী মানুষ যে তাঁহার দানে নিয়মিত জীবনধারণ করিত তাহার সীমা-সংখ্যা নাই।

বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তিও গল্পকাহিনীতে পরিণত হইয়াছে। একবার তিনি মাতার আদেশ পালন করিবার জন্য বর্ষার উত্তাল তরঙ্গসংকুল দামোদর নদ সাঁতার দিয়া পার হইয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগরের হৃদয় কুসুমের মতো কোমল, বজ্রের মত কঠিন ছিল। তিনি কখনও অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেন নাই। তাঁহার স্বাদেশিকতাও ছিল অসামান্য। চিরদিনই তিনি ধুতিচাদর ও চটিজুতা পরিতেন এবং ঐ বেশেই সে যুগের উচ্চপদস্থ ইংরেজ-প্রভুদের সহিত মেলামেশা করিতেন। একবার লাটসাহেবের সেক্রেটারী তাঁহাকে লাট-সাহেবের কাছে আসিবার সময়ে বিলাতী পোশাক পরিয়া আসিতে বলেন। বিদ্যাসাগর লাটসাহেবকে জানাইয়া দেন যে, এই তাঁহার সহিত শেষ সাক্ষাৎ-কার। কারণ ইংরেজের মতো পোশাক পরা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। লাটসাহেব তখন মার্জনা চাহিয়া বলিলেন যে, বিদ্যাসাগর যেমন ইচ্ছা পোশাকে তাঁহার কাছে আসিতে পারিবেন।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পরলোক গমন করেন। বিদ্যাসাগরের কর্মযজ্ঞের অগ্নি আজও নির্বাপিত হয় নাই। শিক্ষাবিস্তার, সমাজসংস্কার, নারীকল্যাণ ও জনসেবার ক্ষেত্রে তিনি যে হিতকর্মের শুরু

করিয়াছিলেন তাহার ঋণ আজও দেশবাসী পরিশোধ করিতে পারে নাই।

বিদ্যাসাগর আজও বাঙালীর সর্বাপেক্ষা আদর্শ চরিত্র হইয়া আছেন।

কতরূপে হেরি তোমা বহুরূপী হে বিদ্যাসাগর,
দুঃখের আঁধার রাতে দীপ্তচূড় তরঙ্গে ভাস্বর॥

সুভাষচন্দ্র ছিলেন কটকের প্রখ্যাত উকিল জানকীনাথ বসুর পুত্র। ভবিষ্যৎকালে তিনি যে একজন অসাধারণ পুরুষ হইবেন তাহার পরিচয় তাঁহার কিশোর-জীবন হইতেই পাওয়া যায়। ছাত্র জীবনে বিবেকানন্দের বইগুলি পড়িয়া তাঁহার মনে ধর্মভাব জাগে এবং দেশের সেবা ও জন-সেবায় তাঁহার আগ্রহ জন্মে। সুভাষ বি. এ. পাশ করিয়া বিলাতে গিয়া সিভিল সার্ভিসও পাশ করেন।

যখন ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলিতেছে,—সুভাষ বিলাত হইতে দেশে ফিরিয়াই সোজা গান্ধীজীর নিকট উপস্থিত হইলেন। মহাত্মা গান্ধীর পরামর্শে তিনি লোভনীয় চাকুরীর মায়া ছাড়িয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলেন। বাংলা দেশে তখন এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন। সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রধান সহায় হইয়া উঠিলেন।

সত্যাগ্রহ আন্দোলনে বাংলায় যুবকদের নেতৃত্ব করার জন্য অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁহারও জেল হয়। জেল হইতে মুক্তিলাভের পর তিনি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করিলেন এবং নানাভাবে দেশের জনহিতকর সেবা করিতে লাগিলেন। দেশবন্ধু এই সময়ে স্বরাজ্যদল গঠন করিলে সুভাষচন্দ্রও এই দলের প্রধান কর্মীরূপে যোগদান করিলেন। ব্রিটিশ কর্তারা তাঁহাকে ভারতের কারাগারে রাখিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। তাই তাহারা তাঁহাকে ভারতের বাহিরে সুদূর ব্রহ্মের মান্দালয়ের কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। দুই বৎসর কারাবাসের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া

গেল। জনগণের চাপে পড়িয়া সরকার তখন ভয় পাইয়া তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য মুক্তি দিল। স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি হইলে তিনি আবার বিপুল উদ্যমে দেশের কাজে নামিলেন। স্বেচ্ছাসেবক দলের নাম করিয়া ভবিষ্যতের সংগ্রামের উদ্দেশ্যে তিনি সেনাদল গড়িতে লাগিলেন। দেশ-সেবার ফাঁকে ফাঁকে তিন বৎসরের মধ্যে তাঁহার চারবার জেল হয়। এইরূপ ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া অবিরত কঠোর পরিশ্রম ও বারবার কারাবাস তাঁহার শরীর সহ্য করিতে পারিল না। ক্রমে তাঁহার দেহে যক্ষ্মার লক্ষণ দেখা দিল। যখন তাঁহার এইরূপ শোচনীয় অবস্থা তখন তাঁহাকে বিনা বিচারে সরকার বন্দী করিয়া রাখিল। ইহাতে তাঁহার শরীরের অবস্থা আরো খারাপ হইতে লাগিল। দেশবাসী তাঁহার জীবনের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িল। দেশের লোক তাঁহার মুক্তির দাবি জানাইয়া তুমুল আন্দোলন শুরু করিলে সরকার তাঁহাকে মুক্তি দিলেন এই শর্তে যে, তাঁহাকে ভারতবর্ষ ছাড়িতে হইবে। এই শর্তে মুক্তি পাইয়া তিনি ইউরোপে চলিয়া গেলেন। ভারতের স্বাধীনতার দাবির কথা তিনি তখন সমগ্র ইউরোপে প্রচার করিতে লাগিলেন।

দীর্ঘ তিনবৎসর ইউরোপে কাটাইবার পর তাঁহার স্বাস্থ্যের অনেকটা উন্নতি হইল। কিন্তু দেশে ফিরিবার কোন উপায় নাই; সরকার তখনও তাঁহার উপর হইতে বিধিনিষেধ রহিত করেন নাই। ভারতে ফিরিবামাত্র বন্দী হইবেন জানিয়াও তিনি লক্ষ্মৌ কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত জওহরলালের আমন্ত্রণে ভারতে আসিলেন। বোম্বাই বন্দরে জাহাজ হইতে নামিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকে আবার বন্দী করা হইল। আবার আরম্ভ হইল তাঁহার কারাজীবন। মুক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গেই দেশবাসী তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদরের সহিত বরণ করিয়া লইল এবং তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদলাভ করিলেন। তিনি উপরি উপরি দুইবার কংগ্রেসের সভাপতি হইলেন। অন্যান্য কংগ্রেসের নেতাদের সহিত বিশেষ করিয়া মহাত্মা গান্ধীর সহিত মতের অমিল হওয়ায় তিনি স্বেচ্ছায় কংগ্রেস সভাপতির পদ ত্যাগ করিলেন। অতঃপর তিনি নিজে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' নামে একটি স্বতন্ত্র দল গড়িলেন।

এই দলের কাজ শুরু হইলে সুভাষচন্দ্রকে প্রথমে হাজতে এবং পরে নিজের বাড়িতে এলগিন রোডে সরকার নজরবন্দী করিয়া রাখিল। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলিতেছে। সুভাষচন্দ্র একদিন ছদ্মবেশে ব্রিটিশ পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া চোখে ধুলা দিয়া পালাইলেন। তিনি আফগানিস্তান হইয়া জার্মানী, জার্মানী হইতে সাবমেরিনযোগে জাপান হইয়া সিঙ্গাপুরে আসিয়াছিলেন। এই সময়ে জাপানীরা ইংরেজদের হারাইয়া ও তাড়াইয়া ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত জয় করিয়াছিল এবং বহু ভারতীয় সেনাকে বন্দী করিয়াছিল। তাহা ছাড়া মালয়, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি অঞ্চলে ভারতের বহু লোক কাজকারবার করিত। বিখ্যাত বিপ্লবী রাসবিহারী বসু বহু পূর্বে ভারত হইতে পলাইয়া গিয়া তখন জাপানে বাস করিতেছিলেন।

তিনি ঐ সব বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের লইয়া একটি সৈন্যদল গঠন করেন। কিন্তু জাপানীদের সহিত মতের মিল না হওয়ায় এই ফৌজের কাজ ঠিকমত চলিতেছিল না। ঐ ফৌজের যিনি কর্তা ছিলেন, তিনি অন্যায়ভাবে ফৌজ ভাঙ্গিয়া দেওয়ার আদেশ দেন। ইহাতে রাসবিহারী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। তিনি অন্যান্য সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া নেতৃত্বের জন্য সুভাষকে আহ্বান করিলেন।

সুভাষচন্দ্র জার্মানী হইতে সাবমেরিনে চড়িয়া সিঙ্গাপুরে চলিয়া আসিলেন। রাসবিহারী তাঁহার হস্তে 'ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের' সর্বভার সমর্পণ করিলেন। এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিয়াই তিনি বেতারে 'আজাদ হিন্দ বাহিনী'র অস্তিত্বের কথা সমগ্র জগতে ঘোষণা করিলেন এবং প্রায় চার মাস পরে ১৯৪৩ সালের অক্টোবরে 'অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার' প্রতিষ্ঠাও ঘোষণা করিলেন। ইহার কয়েকদিন পরেই এই অস্থায়ী সরকার ইংরাজ ও আমেরিকার সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন ও ভারত আক্রমণ করিলেন।

সুভাষচন্দ্রের অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রবলে মুগ্ধ হইয়া পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়েরা নিজেদের যথাসর্বস্ব তাঁহার হাতে তুলিয়া দিল। তিনি তাঁহাদের দেশপ্রীতির এই নিদর্শনে মুগ্ধ হইলেন এবং হিন্দু-মুসলমান-শিখ-খ্রীষ্টান সবজাতিকে লইয়া নূতন করিয়া ফৌজ সংগঠন করিলেন। এই

'মলিত ফৌজের নাম হইল 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ'। ভারতকে স্বাধীন করার আকাঙ্ক্ষা হইল এই ফৌজের দৃঢ়পণ। তাহাদের সম্ভাষণ ধ্বনি হইল 'জয়হিন্দ্'। তাহাদের প্রিয়নেতা সুভাষচন্দ্র হইলেন এই ফৌজের সর্বাধিনায়ক বা নেতাজী। জাপানীদের সাহায্যে অভিযান আরম্ভ হইল। সুভাষচন্দ্রের সেনাদল 'দিল্লী চল' ও 'জয়হিন্দ্' রব তুলিতে তুলিতে ব্রহ্ম সীমান্ত অতিক্রম করিয়া আসামে প্রবেশ করিল। তাহারা মণিপুর ও কোহিমা অঞ্চল দখল করিল। মণিপুরের ইম্ফলে স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা উড়িল।

এদিকে ভীষণ বর্ষা আরম্ভ হইল। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের যোগাযোগ রক্ষা এবং রসদ সরবরাহ অসম্ভব হইয়া পড়িল। অনেক সৈন্য আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িল। তাহাদের চিকিৎসার ঔষধ নাই, খাদ্য নাই। বাধ্য হইয়া সুভাষচন্দ্র তাঁহার সৈন্যদলকে পিছনে হটাইয়া লইয়া গেলেন। জাপানও আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে আর যথাবিহিত সাহায্য করিতে পারিল না। এই অবস্থায় আজাদ হিন্দ্ সরকারের দপ্তর রেঙ্গুন হইতে পুনরায় সিঙ্গাপুরে স্থানান্তরিত হইল।

ইতিমধ্যে রুশ, ইংরেজ ও মার্কিনদের হাতে জার্মান ও জাপানীদের পরাজয় ঘটিল। অ্যাটম বোমার আঘাতে ধরাশায়ী জাপানীরা আত্ম-সমর্পণ করিল। নেতাজী রাসবিহারী বসুর সহিত পরামর্শের জন্য বিমান-যোগে টোকিও যাত্রা করিলেন। আজাদ হিন্দের কাজও ফুরাইয়া গেল। রেঙ্গুন হইতে টোকিও যাত্রার পথে নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া সকলের ধারণা। ভারতীয় সেনাদলে স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুলতা জাগাইয়া সুভাষচন্দ্র বিদায় লইলেন। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ভারতে ফিরিয়া আসিল। ইংরেজ সরকার হাড়ে হাড়ে বুঝিলেন যে ভারতীয় সেনাকে আর বশে রাখা যাইবে না। ভারতবর্ষকে আর স্বাধীনতা না দিলে চলে না। মহাযুদ্ধের ফলে ভারত দরিদ্র হইয়াছে, কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে দুর্বল হয় নাই, ইংরেজরাই বরং দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে—ভারতবাসীকে আর কিছুতেই পরাধীন রাখা যায় না ; বিশেষতঃ সুভাষচন্দ্র

ভারতীয় সেনার মতি-গতিও বিগড়াইয়া দিয়াছেন। ইংরাজ স্বাধীনতা দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

মহাত্মা গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলন ও সত্যাগ্রহ সংগ্রামের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মনেপ্রাণে যোগ ছিল। সুভাষচন্দ্র কোনদিন তাঁহার দাবিকে খাটো করিতে চাহেন নাই। কিন্তু ইংরাজের সঙ্গে তিনি কোন আপোষ বা রফাচুক্তি করিতে রাজী ছিলেন না। সুভাষচন্দ্র মহাত্মা গান্ধীর মতই স্বাধীনতার জন্য সর্বস্বপণ করিয়াছিলেন—তবে শেষ পর্যন্ত উভয়ের পথ হইয়াছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। মহাত্মা গান্ধীর পথটি নূতন, তাঁহারই আবিস্কার। সুভাষচন্দ্রের পথটি চিরপুরাতন, কিন্তু মুক্তিসাধনার চিরকালীন পথ।

সুভাষচন্দ্র বুঝিতেন জোর করিয়া লইতে না পারিলে হিসাবী ইংরেজ কখনো আপনা হইতে স্বাধীনতা দিবে না। এইজন্য প্রয়োজন হইলে বীরের মত সংগ্রাম করিতে হইবে। তিনি সকল সময়ই চাহিয়াছেন পূর্ণ স্বাধীনতা। এজন্য তিনি বল অথবা কৌশলের সব পথই গ্রহণ করিতে রাজী ছিলেন। তিনি বলিতেন—"স্বাধীনতা লাভ করতে হলে বলপ্রয়োগ করতে হবে—সবল কখনও বাধ্য না হলে নিজের অধিকার ছাড়ে না।"

তিনি জগতের সকল সভ্যজাতির সহিত যোগাযোগ রাখিতে চাহিয়াছিলেন এবং অন্য জাতির সাহায্যে স্বাধীনতালাভ করিতে দোষ নাই বলিয়া মনে করিতেন।

তিনি বলিতেন—"স্বাধীনতালাভের জন্য আকুল আগ্রহ জনগণের মধ্যে জাগাতে হবে। এই আকুল আগ্রহ জাগলে একদিন তারা জোর করে স্বাধীনতা কেড়ে নেবে। সত্যাগ্রহ ও অহিংস অসহযোগের দ্বারা কোন অন্যায়ের প্রতিকার হতে পারে, কিন্তু কেবল তার দ্বারা স্বাধীনতা লাভ করা যায় না। যদিই বা তা লাভ করা যায়, সে স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না। বীরত্ব না দেখালে বীর জাতির কাছে মর্যাদা পাওয়া যায় না। সবলের সঙ্গে লড়তে হলে সবল হওয়া চাই। আঘাত সহ্য করলেই শুধু চলবে না, আঘাত দিতে পারার ক্ষমতা দখল করা চাই। স্বাধীনতা আমাদের আসবেই, তার আগে তার দায়িত্ব নিতে পারে এমন দেহে,

মনে, চরিত্রে বলীয়ান মানুষ গড়তে হবে, বীরযোদ্ধার দল তৈরী করতে হবে।

'যেন স্বাধীনতার জন্য যুঝিলে পূর্ণতা যেন নয়,
তোমারে হারায়ে মুক্তাবিহীন শক্তিই মনে হয়।'

মহারাজ নন্দকুমার সাধারণ মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে তিনি আমীন হইয়া নবাব-সরকারের কর্মে ব্রতী হন। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর সময়েও তিনি আমীনই ছিলেন, সিরাজউদ্দৌলার আমলে হুগলীর ফৌজদার পদে উন্নীত হন। ফরাসীদের সাহায্য না করার জন্য নন্দকুমার পদচ্যুত হন। মুর্শিদকুলি খাঁ হইতে নবাব নিজামুদ্দৌলা পর্যন্ত আটজন নবাবের অধীনে তিনি কাজ করিয়াছিলেন। সিরাজের পতনের পর নন্দকুমার ক্লাইভের মুন্সী ও দেওয়ান হন। পরে ক্লাইভের অনুরোধে নবাব মীরজাফর নন্দকুমারকে হুগলি, হিজলি ইত্যাদি পরগণার দেওয়ানি পদ অর্পণ করেন।

সেকালে নন্দকুমারের মত প্রভাবশালী বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্ তেজস্বী বাঙালী কেহই ছিল না—তিনি সেকালের হিন্দু বাঙালীদের সমাজপতিও ছিলেন। হেষ্টিংসের সঙ্গে মনোমালিন্যের ফলে এই মহামতি মহাপ্রাণ ন্যায়বান তেজস্বী ব্রাহ্মণের পতন হয়।

কোম্পানীর কর্মচারীরা গোপনে ব্যক্তিগত ব্যবসায় চালাইত এবং এ-দেশের লোকের উপর অকথ্য অত্যাচার করিত। নন্দকুমার বিলাতের কর্তৃপক্ষকে কোম্পানীর অনাচার, অত্যাচার ও কুশাসনের কথা পত্র দিয়া জানান। সেই পত্র এখানকার ইংরেজ কর্মচারীদের হাতে পড়ে। ইহাতে ইংরেজরা নন্দকুমারের উপর কুপিত হয়। ক্লাইভ বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া নন্দকুমারকে কোম্পানীর অনাচার, অত্যাচার সম্বন্ধে অনুসন্ধানের

ভার দেন। নন্দকুমার কোম্পানীর শাসনের গলদের বিস্তৃত তালিকা পেশ করেন। ক্লাইভ সে তালিকা লইয়া বিলাত যাত্রা করেন।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়ে নায়েব-নাজিম রেজা খাঁ খাজনা আদায় লইয়া প্রজাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করিত এবং বহু অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছিল। হেস্টিংস বড়লাট হইয়া আসিলে রেজা খাঁর বিচারের ভার তাঁহার হাতে পড়ে—আর প্রমাণ সংগ্রহের ভার পড়ে নন্দকুমারের উপর। নন্দকুমার কঠোর পরিশ্রম করিয়া সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিলেন। রেজা খাঁ কিন্তু হেস্টিংসকে বশীভূত করিয়া ফেলিল। দুই বৎসর ধরিয়া বিচারের পর রেজা খাঁ অব্যাহতি লাভ করিল।

এইবার নন্দকুমার প্রকাশ্যে বড়লাট হেস্টিংসের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। নন্দকুমার হেস্টিংসের বিরুদ্ধে কুশাসন, অত্যাচার ও উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ আনিলেন বড়লাটের কৌন্সিলে। সমগ্র দেশের পক্ষ হইতে প্রবলপরাক্রান্ত বড়লাটের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার তেজস্বিতা এদেশের তখন একমাত্র নন্দকুমারেরই ছিল।

হেস্টিংস ইহার প্রতিশোধ লওয়ার জন্য মোহনপ্রসাদ নামক এক দুর্বৃত্তের সাহায্য লইলেন। মোহনপ্রসাদ ছিল বুলাকিদাস নামক একজন শেঠের আমমোক্তার। বুলাকিদাস নন্দকুমারকে কয়েক হাজার টাকার ঋণ বাবদ একটি অঙ্গীকারপত্র দেয়। বুলাকির মৃত্যুর পর সেই অঙ্গীকার পত্রের বলে নন্দকুমার ঐ টাকা তাহার গদি হইতে আদায় করেন। হেস্টিংসের প্ররোচনায় ঐ অঙ্গীকার-পত্রকে জাল বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য মোহনপ্রসাদ মিথ্যা সাক্ষ্য দিল। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন স্যার ইলাইজা ইম্পে। এই ইম্পের বিচারে পত্র জাল করার অপরাধে বিলাতী আইনে নন্দকুমারের ফাঁসির আদেশ হইল।

এইভাবে হেস্টিংস তাঁহার পরম শত্রু নিরপরাধ মহামান্য নন্দকুমারকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে সরাইলেন।

শেরিফ ম্যাক্রেবি সাহেব ফাঁসির পূর্বদিন মহারাজের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। তিনি লিখিয়াছেন—"আমি দেখলাম নন্দকুমার অবিচলিত, যেন কিছুই ঘটেনি। তিনি একটি দীর্ঘশ্বাসও ত্যাগ করলেন না।"

ম্যাক্রেবি জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহারাজ, আপনার কোন অন্তিম বাসনা আছে ?"

নন্দকুমার বলিলেন—"আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, ইহলোকে আমার কোন বাসনাই নেই।"

তারপর কপালে আঙ্গুল ঠেকাইয়া তিনি বলিলেন—"বিধাতার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।"

ম্যাক্রেবি শুধালেন—"কাউকে কিছু বলতে হবে ?"

নন্দকুমার উত্তর দিলেন—"কাউন্সিলের সদস্য মনসন ক্লেভারিং ও ফ্রান্সিসকে আমার শ্রদ্ধা জানাবেন এবং পুত্র গুরুদাসের উপর কৃপাদৃষ্টি রাখতে বলবেন।"

ম্যাক্রেবি বললেন—"কোন আত্মীয়বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা হয় কি ?"

মহারাজ বলিলেন—"দেশশুদ্ধ সকল লোকই আমার আত্মীয়বন্ধু। কার সঙ্গে আলাদা করে দেখা করব ?"

অন্তিম দিনে হাজার হাজার লোক মহারাজকে শেষ দর্শন করিতে আসিল। সকলেই হায় হায় করিতে লাগিল।

মহারাজ ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া ধ্যানমগ্ন হইয়া রহিলেন। পাল্কী করিয়া মহারাজকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাওয়া হইল—সেখানেও লোকারণ্য, হাজার হাজার নরনারী আকুল হইয়া কাঁদিতেছে, হাহাকার করিতেছে, কোম্পানীর নামে শাপশাপান্ত করিতেছে। মহারাজ কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া অবিচলিত চিত্তে ধীর শান্ত পদক্ষেপে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করিলেন। তিনি চারজন ব্রাহ্মণকে তাঁহার মৃতদেহ বহনের জন্য আদেশ দিলেন।

তারপর তিনি হাত বাড়াইয়া দিলেন। হাত দুইখানি রুমাল দিয়া বাঁধা হইল। ফাঁসির মঞ্চে তিনি সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। মুখে কোন বিকার নাই, কণ্ঠে কোন কথা নাই, চোখে এক বিন্দু জল নাই, নাকে দীর্ঘশ্বাস নাই, বুকে কোন চাঞ্চল্য নাই। মহারাজ মহাবীরের মত মৃত্যু-বরণ করিলেন।

ম্যাক্রেবি লিখিয়াছেন যে, এমন ধৈর্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে মৃত্যুবরণ করিতে তিনি কখনও কাহাকেও দেখেন নাই, কখনও কাহারও কথা শুনেন নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে এত বড় বিরাট পুরুষ বাঙ্গালায় আর কেহ ছিল না। বিদেশী বণিকদের বিচারে এই ভাবে তাঁহার জীবনাবসান ঘটিল। বিলাতে পার্লামেণ্টে এজন্য হেস্টিংসকে আসামী হইয়া দাঁড়াইতে হইয়াছিল। কিন্তু বাগ্দণ্ড ছাড়া তাঁহার কোন দণ্ড হয় নাই।